লক্ষিত হয়। অদৃষ্টগুণে আমাদের সুমিত্রা পঞ্চরূপা ও রাজরাণী। কিন্তু উচ্চকুলোদ্ভবা রাজ্ঞী বলিয়া অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা, চপলতা বা বিলাসিতা, আলস্য বা হৃদয়হীনতা, তাঁহার প্রকৃতিতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত তাঁহার চরিত্র বহুল সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত। তাঁহার হৃদয় সরল, উদার, স্নেহ প্রবণ;—তাঁহার অন্তঃকরণ পরদুঃখকাতর, সত্যসংযত, ওজস্বিতাপূর্ণ—সুমিত্রা প্রেমময়ী, শক্তিময়ী, ও দয়াময়ী। সুমিত্রা স্বামীতে প্রগাঢ় অনুরক্তা, সন্তানে অনুপম স্নেহযুক্তা, গৃহকার্য্যে মনোযোগ-প্রতিমূর্ত্তি। সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেদীপ্যমান। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যে সকল গুণে প্রাচীন ভারতের আর্য্যললনাগণ প্রাতঃস্মরণীয়া এবং জগতের নমস্যা হইয়াছেন, যে সকল উৎকর্ষে সীতা ও সাবিত্রী, শকুন্তলা ও দময়ন্তী, পৃথিবীতে পুণ্যশ্লোকা হইয়াছেন, সে সকল গুণ আজিকার দিনে খুব সুলভ নহে।

আমরা সুমিত্রাচরিত্রের প্রধান প্রধান গুণগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া, গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার পূর্ব্বক, তাহাদের সত্যতা প্রতিপালনের চেষ্টা করিব।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা

- (১) পতিভক্তি
- (২) ভ্রাতৃস্নেহ
- (৩) পুত্রবাৎসল্য
- (৪) অন্যান্য কর্ত্তব্য
  - (ক) প্রতিজ্ঞাপালন
  - (খ) আত্মসম্মান-বোধ
  - (গ) সহৃদয়তা
  - (ঘ) অভিমান ইত্যাদি

কর্ত্তব্যপরায়ণতা—কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান সুমিত্রাচরিত্রের মূলভিত্তি। তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণ সকল—অতুল পতিভক্তি অগাধ ভ্রাতৃস্নেহ, অকৃত্রিম পুত্রবাৎসল্য প্রভৃতি সমস্তই সেই এক মূলস্তম্ভের উপর সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই অন্যান্য সকল মহত্ত্বের কেন্দ্রীভূত। ইহার প্রমাণ গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, (৯ পৃঃ), প্রেমবিহ্বল, আকাঙ্ক্ষাকাতর স্বামীর সহিত তাঁহার কথোপকথনেই ইহার সূচনা। স্বামী বিক্রমদেব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথা ছিলে প্রিয়ে?"

হৃদয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যভার লইয়া সুমিত্রা উত্তর করিলেন—

"নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস।"

সুমিত্রা রাজরাণী; অথচ কর্ত্তব্যনিষ্ঠগৃহিণী; তাঁহার অবশ্যসম্পাদ্য অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি তাঁহার কাছে উপেক্ষিত নহে; তাই কহিলেন—

"থাকি যবে গৃহকাজে—
জেনো নাথ তোমারি সে গৃহ
তোমারি সে কাজ"

কি সুন্দর চিত্র! কি অপূর্ব্ব কবিত্ব! কুসুম-কোমল পতিপ্রেমের সহিত কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান কি সুন্দর স্বর্গীয় ভাবে বিজড়িত!! "কেবল স্বামীর বাসনা পরিতৃপ্ত করিলেই গৃহিণীর কর্ত্তব্য শেষ হয় না" —এই নীতিটী সুমিত্রার প্রথম উক্তিতেই কেমন সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে। মহাকবি সেক্ষপীয়রের জগদ্বিখ্যাত "জুলিয়স্ সিজর" নাটকের পোর্শিয়া-চিত্রও এই সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তব্যবুদ্ধির কাছে হীনপ্রভ!

তৎপরে পতি যখন মর্ম্মকাতর হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে কহিলেন—

"সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি
* * * *
বাহিরে ডাকুক পড়ে বাহিরের কাজ"
(১০ পৃঃ)

অমনি সুমিত্রা উত্তর করিলেন—

"কেবল অন্তরের তব? নহে নাথ নহে,
রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে;
(ঐ)

অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী"

কি সুন্দর দেবী-দুর্লভ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা!!

স্থানান্তরে, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজলক্ষ্মী সুমিত্রা ঘোর মর্ম্মাহতা। কিন্তু রাজা বিক্রমদেব তাহার প্রতিকার-বিমুখ। তিনি সুমিত্রাকে কহিলেন—

* * * *

জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে" (১১ পৃঃ)

তাহাতে রাজ্ঞী কহিলেন—

"শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছি ছি মহারাজ,
একি ভালবাসা?
* * *
আমারে বেসোনা ভাল রাজশ্রীর চেয়ে।"
(ঐ)

অন্যত্র—

"স্থান দিও হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিওনা আমারে" (ঐ)

"এই মুছিলাম অশ্রু, যাও রাজকাজে"
(১৩ পৃঃ)

"ওই শুন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আবাহন!!" (ঐ)

যে সাধ্বী রমণী, স্বামী বিমুখ হইলে, তাঁহার পূর্ণ ভালবাসা—ষোল আনা হৃদয়টুকু পাইবার জন্য জগতের অপর সকল স্বার্থ অম্লানমুখে বিসর্জ্জন করিতে পারে; যাহার অভাব হইলে, এমন কি প্রাণ পরিত্যাগেও কুণ্ঠিতা হয় না, সেই রমণী স্বামীর প্রাণভরা প্রেম অঞ্জলি ভরিয়া পাইয়াও, তাহা যেন দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিতেছেন! ইহা কি অসাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত নহে? পতির প্রতি এই রাজ্যশাসন, প্রজাপালন এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ কি কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-জনিত নহে? সুমিত্রা উপদেশে যথার্থই স্বামীর প্রতি গুরুতুল্যা। প্রেমময় পতির ঘোর মর্ম্মকাতরতা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র

বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি দৃঢ়ব্রতরূপ অটলাচলে দাঁড়াইয়া স্বামীর হৃদয়ভেদী কাতরোক্তি—যাহাতে সামান্যা নারী একেবারে বিমুগ্ধ ও বিগলিত হইতেন—তাহাতে সনির্ব্বন্ধ বায় বিরাগ দেখাইলেন। তৎপরে সুমিত্রার আত্মত্যাগ কি অলোকসামান্য নহে? তিনি পতির পূর্ণ ভালবাসার অংশ স্বহস্তে অন্য কার্য্যে বণ্টন করিয়া দিতে ব্যগ্র—তাঁহার একাগ্র হৃদয়কে বিভিন্ন কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত। শুধু প্রস্তুত নহে—নিজে উপেক্ষিতা হইয়া থাকিতেও প্রস্তুত। তাই বীর-প্রাণা সাধ্বী কহিলেন—

"ঘৃণা কর মহারাজ ঘৃণা কর মোরে,
দোষ ভাল—একেবারে ভুলে যাও যদি
লোক লাজ হয়—তুচ্ছ এ নারীর তরে,
করিও না বিসর্জ্জন সমস্ত পৌরুষ।"
(২৩ পৃঃ)

কেনইবা না বলিবেন? তাঁহার নারীর হৃদয়—অনমনীয় বোধ। প্রকৃতিপুঞ্জের করুণ ক্রন্দনে যে হৃদয়-তন্ত্রী একতানে বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্তান ক্ষুধায় কাঁদিতেছে—আপনার পাশব অত্যাচারে জীবন্মৃত হইতেছে—সে দৃশ্য দেখিয়া, সে পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া মায়ের প্রাণ স্থির থাকিবে কেমন করিয়া? তাই স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রতিমা সুমিত্রা নিজের সমস্ত স্বার্থ বলি দিতে এত ব্যগ্র! তাই তিনি কখনও স্নেহ-মধুর উপদেশে, কখনও মৃদু-তীব্র ভর্ৎসনায়, কখনও বা মজ্জমানেরে পতির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রবৃত্তি ফিরাইতেছেন। পরিশেষে ভ্রাতা কুমার-সেনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, সেই কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে, তাঁহার ছিন্নমুণ্ড স্বহস্তে লইয়া কাশ্মীরের রাজপদে উপহার! ধন্য সুমিত্রা! ধন্য তোমার কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা!! আর যে কবি এরূপ উচ্চ আদর্শে নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে পারেন, তিনিও ধন্য!

(১) পতিভক্তি—যে কারণে আমাদের সুমিত্রা কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সেই কারণ হইতেই তাঁহার অপার অপরিমেয় পতিভক্তি উৎপন্ন।

(ক) "দিতাম তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস" (৯ পৃঃ)

(খ) "কেবল অন্তরে তব রহে—
আছে,
অন্তরে প্রেয়সী তব রহিবে মহিষী"
(১৮ পৃঃ)

(গ) "শোন প্রিয়তম,
আমার প্রকৃতি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশী নহি" (১১ পৃঃ)

(ঘ) "স্থান দিও হৃদয়ের মাঝে

(ঙ) "কেমনে বোঝাব?
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি
প্রেমে" (১৮ পৃঃ)

(চ) "ভাই, রাজার মার্জ্জনা; কর রোষ
আমার উপরে" (৩৭ পৃঃ)

(ছ) "চরণে পতিত দাসী
কি করিবে চাও বল" (২৬ পৃঃ)

এ পতিভক্তি আদর্শ হিন্দুরমণীর চরিত্রের অলঙ্কার স্বরূপ। সুমিত্রার প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক কার্য্যে তাহা উজ্জ্বলরূপে স্ফুরিত। কবি তাহা অতিশয় দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়া, সুমিত্রাকে আদর্শসতী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইয়াছে। তবে সুমিত্রাকে কেবল পতিরতা করিয়া চিত্রিত করিলে কবির উচ্চ আদর্শ খাটো হইয়া পড়িত। কবি পতিপ্রেমকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, কবি তাঁহাকে অন্যান্য কর্ত্তব্যের প্রতিও সমুচিত অনুরক্তা করিয়াছেন। ইহাতে সুমিত্রার পতিভক্তি আরো সুন্দর ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন স্বামী বিক্রমদেব কাতরকণ্ঠে অভিমানভরে কহিলেন—

"কোথা যাও একবার ফিরে চাও রাণী,
রাজা আমি পৃথিবীর—
তাই কি ঘৃণায় দর্পে চলে যাও দূরে,
মহারাণী রাজরাজেশ্বরী?" (২৫ পৃঃ)

তখন সে কাতরতার প্রতি—সে ঐকান্তিক আগ্রহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সুমিত্রা উত্তর করিলেন—

"যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত অন্তর
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই
কভু" (ঐ)

পতিব্রতা-নিঃসৃত কি মর্ম্মভেদী কঠোর উক্তি! কর্ত্তব্যজ্ঞানবিমিশ্র অপূর্ব্ব পতিপ্রেমের কি নিদারুণ অভিব্যক্তি! এক দিকে পতিপ্রেমের অন্তর্নিহিত প্রখর স্রোতঃ অপর দিকে রাজধর্ম্ম ও প্রজাপালনরূপ কর্ত্তব্যের সকরুণ আহ্বান!! উভয়ের কি সুন্দর সংমিশ্রণ! যেমন পার্শ্বে অন্ধকার না থাকিলে আলোকের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না, পার্শ্বে দুঃখ না থাকিলে সুখের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না; তেমনি দুইটী বিভিন্নপথগামী চিত্তবৃত্তির সংঘর্ষে, সুমিত্রার পতিপ্রেম কি সুন্দরই ফুটিয়াছে!! সিদ্ধহস্ত নিপুণ কবির কি সুন্দর কৌশল!!

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সুমিত্রা হৃদয়ে অণুমাত্র পতিদ্রোহিণী নহেন। তিনি সম্যক্‌রূপে পতির অনুগতা ও পরাশ্রিতা। রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন এই দুইটী কর্ত্তব্যপালনে রাজাকে বিমুখ দেখিয়াই রাজলক্ষ্মী পতির প্রতি বাহ্য বিরাগ মাত্র দেখাইতেছিলেন, এ কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। যখন কোন মতে তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন অভিমানে, দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় আকুলিতা হইয়াই, প্রজাবৎসলা দীনজননী কহিতেছিলেন—

"ঘৃণা কর মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে,
* * একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও ভাল * * (২৬ পৃঃ)

কিন্তু সাধ্বী পরমুহূর্ত্তেই যাতনায় মর্ম্মবিদ্ধ হইলেন। রাজা যখন কহিলেন—

"এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর।
নির্ম্মম! নিষ্ঠুর!! পাষাণ-প্রতিমা তুমি!"

অমনি সুমিত্রার হৃদয় গলিয়া গেল—পতির কাতরোক্তি তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ—মর্ম্মাহত হইয়া কাতর-

দুঃখে কহিলেন—"স্বামিন্! প্রভো! আমি "পাষাণ-প্রতিমা" নই—আমায় প্রতি বিনা দোষে এত "কঠিন বচন" প্রয়োগ করিতেছ—আমি তোমার "চিরানুগতা" "পদাশ্রিতা"—প্রেমাভিলাষিণী দাসী মাত্র।" তখন ধূলিধূসরিতা লতিকার ন্যায় কাতর ও বিনত হইয়া সুমিত্রা কহিলেন—

"চরণে পতিত দাসী কি করিতে চাও
কর—
—কেন রোষ বিনা অপরাধে" (২৬ পৃ)

তখনও স্বামী নির্ব্বন্ধত্যাগ করিলেন না। সাধ্বী অনন্যোপায় হইয়া, হৃদয়ের প্রতপ্ত বাসনা ও পতিপ্রেম অশ্রুরূপে বাহির করিলেন। সুমিত্রা কাঁদিলেন। মরি! মরি!! কবির কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানে ও কোমল পতিপ্রেমে—কাঠিন্যে ও কোমলতায়, পাষাণে ও প্রসূনে কি অপূর্ব্ব সম্মিলন! কি মধুর সমন্বয়! ধন্য কবি! ধন্য তোমার লেখনী!!

তৎপরে স্বামীর অপযশ প্রক্ষালনের জন্য সাধ্বী স্বীয় আত্মীয়গণকে দমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সক্রোধে কহিলেন—

"স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে।"

"অবিলম্বে যাও, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে।"
(২৭—২৮ পৃঃ)

ইহাও কি সুমিত্রার স্বামি-ভক্তি ব্যঞ্জক নহে?

স্থানান্তরে, যখন সুমিত্রা ও তাঁহার ভ্রাতা কুমার সেন বিক্রমদেবের শিবির প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত ও অপমানিত হইলেন এবং উদ্ধত যুবরাজ, যুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন, তখন পতিহিতৈষিণী রাজ্যলক্ষ্মী, স্বামীর ও রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় অতিমাত্র ভীতা হইলেন। তিনি সহোদরকে মিনতি করিয়া যুদ্ধ-বিরত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন—

"ভাই রাজারে মার্জ্জনা কর" (৬৭পৃঃ)

পতিকৃত ভ্রাতৃ-অপমান সতী নিজশিরে লইয়া কহিলেন—

"কর রোষ আমার উপরে" (ঐ)

তৎপরে সুমিত্রার বিনয়ে ও সান্ত্বনায়, কুমার সেন বিক্রমদেবকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইয়া যখন কহিলেন—

"যুদ্ধ বীরধর্ম্ম বটে
ক্ষমা তার চেয়ে বীরধর্ম্ম অধিক"

তখন পতিব্রতা হৃদয়ে বল পাইলেন—আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভ্রাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—

"ধন্য ভাই বীর তুমি, মহাপ্রাণ
তুমি নরপতি এ নরসমাজমাঝে"

যখন সুমিত্রা দেবীমন্দিরে জগজ্জননীর পূজায় নিবিষ্টা, তখন তিনি একমাত্র পতির মঙ্গলকামনাই করিতেছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"আজ সব পূজা ব্যর্থ হল—
শুধু সে সুন্দর মুখ পড়ে মনে—
সেই প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটী

সেই সন্ধ্যাপরে একা শুধু মহারাজ।

* * *

থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
'ফিরে এস, ফিরে এস রাণী'—
প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর'—

* * *

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে
গিয়াছেন বনে, আমি যাব পতিসত্য
পালনের লাগি। যে সত্যে আছেন
বাঁধা
মহারাজ রাজলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
ব্যর্থ হইবে না—সামান্য নারীর তরে॥

(৩১—৩২ পৃঃ)

এই উক্তিটী সাধ্বী সুমিত্রার সমগ্র হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। পতিভক্তি—পতি-হিতৈষণা যে তাঁহার শরীরের শিরায় শিরায় প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে বিরাজমান, উদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ হেন সুমিত্রা-চিত্র কবির ইন্দ্রজালময় লেখনীর অপূর্ব্ব প্রহেলিকা নয় কি? তাঁহার শিল্প-তুলিকার বিশ্ববিমোহন চিত্রপট নয় কি?

(ক্রমশঃ)

দেবলরাজ।

(৪০৪ সংখ্যা ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

(৩)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবনাথ পালকে হাঁড়ী গড়িবার মাটীর জন্য কখন শ্রীনগর, কখন বা চৌবেড়িয়া যাইতে হইত। ঐ দুইটী জনপদ তখন ঘোরারণ্যে আচ্ছন্ন ছিল, আমরা সে কথারও উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীনগরের জঙ্গলের মধ্যে তখন কত কালের পুরাতন একটী বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। ঐ পুষ্করিণীর ঠিক মধ্যস্থলে একটী মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইত। কোন কোন দুঃসাহসী ব্যক্তি কখনও কখনও ডুব দিয়া ঐ জলমধ্যগত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিত বটে, কিন্তু কেহ কখন উহার তলস্পর্শ করিতে পারে নাই। উহার ঐ প্রদেশের গভীরতা কত, তাহা নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু ঐ গভীরতা ৪০ হাতের যে কম নহে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। জল এমন স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যপ্রদ যে, শ্রীনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদূরবর্ত্তী লোকেরা উহার জল লইয়া গিয়া পান ও পাকাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিত। চতুর্দ্দিকের পাড় অতিশয় উচ্চ। ঐ পাড়ই আটাল ও রাঙ্গামাটীর আকর স্বরূপ ছিল। কুম্ভকারেরা নিয়ত মৃত্তিকা খনন করায় চারি দিকের পাড়েই অনেকগুলি গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। দেবনাথ এক দিন পশ্চিম পাড়ের পূর্ব্বপার্শ্বে মাটী কাটিতেছিল। হঠাৎ পূর্ব্ব

শ্যাঙ্কের পশ্চিম পার্শ্বে তাহার দৃষ্টি পড়িল। একটা বৃহৎ গাভিণী রামছাগী একটা গর্ত্তের মুখের সমীপে চরিতেছে। যে গর্ত্তের সম্মুখে ছাগী চরিতেছিল, ঐ গর্ত্তের মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেবনাথ তাহাও দেখিতে পাইল। তখন দিবা তৃতীয় প্রহর অতীত-প্রায়।

অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহর। পরিষ্কৃত দিবা-লোক। বায়ুপ্রবাহ আদৌ নাই। সরোবরের স্বচ্ছ জল স্থির ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপক। জলের উপর কুমুদ-জাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের পত্র ভাসমান। এই পত্রগুলি বিচিত্র, বিধাতার লীলাবিশেষের বিচিত্র রঙ্গভূমি। পত্রগুলি আকারে ছাব্বিশ ইঞ্চি ছাতার অপেক্ষাও বৃহৎ। ছাতার শিকের ন্যায় কেন্দ্র হইতে পরিধিস্পর্শী ষোড়শটী শিরায় পত্রগুলি বিভক্ত। উভয় শিরার মধ্যস্থ পত্রভাগ এক একটি মরকতময় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজবৎ প্রতীয়মান। প্রত্যেক শিরো-পরি তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকশ্রেণী সুসজ্জিত। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি ক্ষুদ্র মৎস্য লম্ফ প্রদানে পত্রোপরি পতিত ও কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এক প্রকার মৎস্যভুক্ ক্ষুদ্রাবয়ব পক্ষী তৎক্ষণাৎ ঐ কণ্টকবিদ্ধ মৎস্যগুলি ভোজন করিতেছে। ঐ পাখীগুলা মৎস্যভুক্, কিন্তু জল হইতে মৎস্য শিকারে অক্ষম। এজন্য জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ পাদপনিচয়ে তাহারা নিয়ত বাস করিয়া থাকে। দেবনাথ পত্রের মাটি কাটা মাথায় উঠিয়াছে,—'হাঁ' করিয়া এই কাণ্ড দেখিতেছে। অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যস্থ প্রজ্বলিত দীপদ্বয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে। ক্রমে তাহার বোধ হইল, দীপ দুটি যেন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিতেছে। দেবনাথের নয়ন সচল দীপ দর্শনে অচল হইল। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড একটা মুখ বাহির হইয়া সমীপস্থ ছাগীকে গ্রাস করিল। একখানা ছাগ-চর্ম্ম জড়াইলে যেরূপ আকার হয়, ছাগী সেই মুখকবলে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সেইরূপ হইয়া গেল। প্রজ্বলিত দীপ দুইটা সেই মুখের চক্ষু,—একবারে জ্বলিতেছিল,—বাহিরে দিবালোকে আসিয়া নির্ব্বাণ হইয়া গেল। দেবনাথ ছাগগ্রাসী জন্তুকে আর কি মনে করিয়াছিল, অজ-গর সর্প বলিয়া চিনিতে পারে নাই। দেব-নাথের জননী যখন পুত্রমুখে এই বিবরণ শ্রবণ করেন, তখনই একটা অজগর সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কেননা শ্রীনগরীর অজগরের কথা তাঁহার পূর্ব্বে জানা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস যে, এই অজগরই সে দিন শীতাতপ নিবারণজন্য দেবনাথের মস্তকে 'ছত্র' ধরিয়াছিল। এ দেশীয় সর্ব্ব-সাধারণের ধারণা, যে নরনারী সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা হয়, তাঁহারা ভবিষ্যতে রাজা বা রাণী হইয়া থাকেন। ভারত-ইতিহাস পাঠকগণ জানেন যে, আর্য্যাবর্ত্ত-মহিষী রূপজ্যোতির বাল্যকালে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।

দেবনাথ পত্রের মস্তকে [illegible]

যে দিন ফণাছত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহার অল্পনাত্ত পূর্ব্বে একদা একজন জ্যোতির্বিৎ দৈবজ্ঞ হাঙ্গরীবাকে উপস্থিত হয়েন। তিনি এ বাড়ী সে বাড়ী বেড়াইয়া অবশেষে দেবনাথের ভবনে শুভাগমন করেন। দৈবজ্ঞ দেখিলে সকলেরই ভবিষ্যৎ জীবনের দুই একটী কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। দৈবজ্ঞ ঠাকুর পার্শ্ববর্ত্তী প্রশ্নকারিগণের সহিত আলাপ করিতেছেন—কাহারও বা হাত দেখিতেছেন;—কিন্তু মধ্যে মধ্যে দেবনাথের দিকে খর দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। তখন দেবনাথ "চাকঘরে" বসিয়া ঘূর্ণায়মান চক্রের উপরে বড় বড় কলসী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। দেবনাথের অসামান্য রূপ, উজ্জ্বল গৌর কান্তি, বীরত্ব ও সাহসব্যঞ্জক বদনশ্রী, কুম্ভকার-সাধারণ-দুর্লভ কুম্ভকারিণী লঘুহস্ততা প্রভৃতি দর্শনে দৈবজ্ঞ মুগ্ধ হইয়াছেন। কখনও বা ক্রিয়মাণ কার্য্যে তাহার প্রগাঢ় অভিনিবেশ দেখিয়া ভাবিতেছেন,—"বিধাতার বিচিত্র লীলা,—এমন রূপকেও এমন নীচ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন!" দেবনাথের দৈহিক একটা চিহ্নে দৈবজ্ঞের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই চিহ্নটী উত্তমরূপে দেখিবার জন্য দেবনাথকে নিকটে আহ্বান করিলেন। দেবনাথ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিতে চাহেন না। জননী একটা ধমক দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিলেন। দৈবজ্ঞ অগ্রে দেবনাথের কর-রেখা পর্য্যালোচনা করিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার ললাট মার্জ্জন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবনাথের জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"মা, তোমার পুত্রের অবস্থা এবং তোমার বাড়ী ঘরের শ্রী ছাঁদ দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য যদি সত্য হয়, তবে তোমার এই পুত্র রাজা হইবে;—এই দেখ, কপালে রাজদণ্ড! আর কর-রেখায় যে সব সুলক্ষণ আছে তাহা তুমি বুঝিবে না।" এই উক্তি করিয়া দেবনাথের ললাটস্থ পরিস্ফুট রাজদণ্ড জননীকে দেখাইয়া দিলেন। দেবনাথ হাসিয়া কহিলেন,—

"ঠাকুর, আপনার গণনায় ভুল হইয়াছে, আমার কপালে ওটা রাজদণ্ড নহে,—যমদণ্ড।" এই কথা বলিয়া সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চাকঘরে গেলেন এবং কলসী নির্ম্মাণে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী জনগণের কেহ হাসিল, কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে খড়-উড়া চালা ঘরকে রাজপুরী বলিয়া বিদ্রূপ করিল, কেহ বা দৈবজ্ঞ-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গম্ভীর ও নীরব ভাব প্রদর্শন করিল। দেবনাথ-জননী একটী সিকি সহ এক কাঠা চাউলের সিধা সাজাইয়া দৈবজ্ঞকে দক্ষিণা দিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দেবনাথের মস্তকে নিদ্রাকালে ভুজঙ্গ অজগর ফণাছত্র ধরিয়াছিল, এই সংবাদ পাইবামাত্র শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসিনী দেবনাথ-জননীর উপরি-উক্ত দৈবজ্ঞবাক্যে

অধিকতর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কারণেই সে দিন দম্ভ-সহকারে বলিয়াছিলেন, "রাজার মেয়ে অবশ্যই রাজার মা হবে।"

(৪)

যে তিনখানি জনপদের সহিত এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আছে, আমরা গল্পের প্রারম্ভেই সেই তিনখানির উল্লেখ করিয়াছি। চৌবেড়িয়া তন্মধ্যে অন্যতম। এই চৌবেড়িয়ায় দেবনাথ-জননীর পিত্রালয়। দেবনাথের মাতামহের নাম রাজারাম পাল। রাজারাম ঋদ্ধিমান্ লোক। তাঁহার কয়েকখানি ক্ষুদ্র তালুক ছিল এবং তাঁহার ঘরে পুরুষানুক্রমে বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। ঠাকুর গড়া বা হাঁড়ী গড়ার ব্যবসায় তাঁহাদের বংশে ছিল না। রাজারাম নিজে সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। চৌবেড়ে, শ্রীনগর ও হাবিরবাঁক এই তিনখানি গ্রামে তৎকালে প্রায় তিন শত ঘর কুম্ভকারের বাস ছিল। রাজারাম তৎসর্ব্বাপেক্ষা বিষয়ী ও ভদ্র লোকের ন্যায় ক্রিয়াকলাপশীল ছিলেন। এজন্য অপরাপর লোকে তাঁহাকে "কুমারের রাজা" বলিত। নামও রাজারাম। রাজারামের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। এরূপ স্থলে পিতামাতার নিকট পাঁচ ভাইয়ের এক ভগ্নীর বড়ই আদর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজারামের আদরের কন্যাটি বড়ই রূপসী ছিলেন। বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় দেখাইত। এই কারণে রাজারাম কন্যাকে "রাজকন্যা, বা রাজার মেয়ে" বলিয়া আদর করিতেন। ক্রমে তাঁহার এই উপাধি প্রতিবেশিমণ্ডলীতে, পরে গ্রামে প্রথিত হইয়াছিল। তিনি আপনাকে একটী ক্ষুদ্র রাজার কন্যা বলিয়া আপনার মনেও অভিমান রাখিতেন—ঘটনা-বিশেষে সে ভাব প্রকাশও করিতেন। সেই জন্যই সে দিন পুত্রের শাস্ত্রীয় অবিশ্বাসকে সংযত করণার্থ "রাজার মেয়ে অবশ্যই রাজার মা হইবে" শপথপূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন।

আমরা এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটী সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত প্রদান করা হয় নাই, অথচ এই স্থলে তাঁহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক হইতেছে।

যশোহর জিলার অন্তর্গত কায়বা নামক স্থানে কয়েক ঘর পশ্চিমদেশীয় পাঁড়ে উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়া বাস করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময়ে তাঁহারা কতকটা বাঙ্গালী ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, আধ-বাঙ্গলা, আধ-হিন্দীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন সেই বংশীয় যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, এক "পাঁড়ে" উপাধি ভিন্ন আর সর্ব্বাংশেই তাঁহারা "বাঙ্গালী বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের সঙ্গে কয়েকটী রাজপুত ও ক্ষত্রিয় জাতীয় ভৃত্য

আসিয়াছিলেন। আমাদিগের বর্ণনার সময়ে ক্ষত্রিয়জাতীয় ভক্তদিগের বংশে একটী অনাসক্ত যাজনশীল পুরুষ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটী পুত্র কন্যার জনক হইয়াও অর্থ উপার্জ্জনে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না। ক্রমে ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে সাধ্বী পত্নীর অনাহার ঘটিতে লাগিল। একদিন তিনি স্বামীকে কহিলেন,—

"আপনি আশুতোষ মহাদেবের পরম ভক্ত, তাঁহার নিকট কিছু ধন প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই দিবেন। তিনি নিজে দিগ্বাস কপালমালী শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তিনি ভক্তগণকে ধনবান্ করিয়া থাকেন। আপনি ধন-কামনায় তাঁহারই আরাধনা করুন, তাহা হইলে আমাদের এ দুঃখ থাকিবে না।

পত্নীর পুনঃ পুনঃ এইরূপ উত্তেজনায় ক্ষত্রিয় সাধু গৃহত্যাগ করেন। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীনগরের অজগর ও শার্দ্দূলসঙ্কুল বোয়ারপাই তপস্যার জন্য মনোনীত করেন। এই সন্ন্যাসীই ভবিষ্যৎ শুভসূচনা পূর্ব্বক কণচক্রী দেবনাথকে অভয় দান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)।

প্রভাতী।

(৪০৪ সংখ্যা—১৭২ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনিল।

অনিল জীবনসমুদ্রের ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যখন কূলপ্রাপ্ত হইল, তখন চাহিয়া দেখিল—সংসারে বড় সুখ—বড় মধু।

অনিল বণিকের ছেলে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে বাণিজ্যস্থলে যাইতে নৌকা ডুবিয়া জলপথে তাহার আত্মীয় সকলের মৃত্যু হয়, কিন্তু দ্বাদশ বৎসরের বালক অনিল মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াও রক্ষা পায় ও পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করে। যে সময় যে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেও তখন দশম বৎসরের বালিকা প্রভাতী। অনেক দিনের কথা। এক দিন সেই চক্রবাক্-পরিশোভিতা হংস-মেখলা নদীর তটে প্রভূত পুষ্প-সমন্বিত স্বরচিত উচ্চ স্তবকে উপবিষ্ট হইয়া বালক গত দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, বালিকা নিকটস্থ তরুশাখা আনত করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে করিতে ডাকিল "অনিল অনিল!" অনিল মুখ ফিরাইয়া দেখিল প্রভাতী; পুষ্প-চয়ন-শ্রমে বালাতপে রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায় প্রভাতীর মুখ শোভা পাইতেছে।

অনিল বালিকার সহাস্য মুখ দেখিয়া আপনার অতীত দুঃখ ভুলিয়া গেল। বাল্য-সুলভ সরলতায় হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রভাতী কহিল "ভাই, তুমি কি ভাবিতেছিলে? তোমার মনে কি কোনও দুঃখ হইয়াছিল?

অনিল। প্রভাতী! তোর ভালবাসায় আমি আপনার দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। তোর হাসি মুখ দেখিলে আমার আর কিছু মনে হয় না।

প্রভাতী। তুমি আমাকে বোনের মত ভালবাস, আমিও তোমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসি।

অনিল। তুমি আমাকে প্রথম নদী-তীরে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া মধুমতীর সাহায্যে গৃহে লইয়া আইস ও বালিকা হইয়াও প্রবীণার ন্যায় আমার সেবা শুশ্রূষা কার্য্যে রত হও। অতএব তুমিই আমার জীবন-দায়িনী। তোমাকে তো আমি ভাল-বাসিতেই পারি, তুমি আমাকে কেন ভালবাস?

প্রভাতী। হাঁ ভাই, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। কেন জানি না, বোধ হয় তুমি আমার কেউ হও।

অনিল। তোমার পিতাও বণিক্, আমার পিতাও বণিক্। কিন্তু তোমরা এক দেশের, আমরা আর এক দেশের; তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

প্রভাতী। বোধ হয় আর জন্মের কোন ও সম্বন্ধ থাকিবে।

এই বলিয়া সে একটি উপকথা বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতামহীর নিকট সে এই উপকথাটি শুনিয়াছিল।

এক রাজ-মাতা তাহার পাচক ব্রাহ্মণের ছেলেকে বড় ভালবাসিত। তাহাকে ভাল খাওয়াইবার জন্য ও ভাল পরাইবার জন্য তিনি এত ব্যস্ত হইতেন যে, পরে নিজেই মনে মনে লজ্জিত হইতেন। তাহার ইচ্ছা হইত যে, সর্ব্বদাই সেই ছেলেটীকে কাছে কাছে রাখেন। কিন্তু রাজমাতা হইয়া একটা ভৃত্যের পুত্রকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখা কিরূপে সম্ভব হয়? এই ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, মা ভগবতী নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিতেছেন "ও ছেলেটা তোর কে হব, তা তুই জানিস্? ও তোর পূর্ব্ব জন্মের কনিষ্ঠ পুত্র। অতএব তুই উহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিয়া আশা পূর্ণ কর।"

রাণী জাগ্রত হইয়া বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেটাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এমন হইত কেন?

প্রভাতীর উপকথা শেষ হইল। অনিল কহিল তবে তাহাই হইবে। কিন্তু প্রভা? আমি আর অধিক দিন তোমার কাছে থাকিতে পারিব না। আমার পিতাঠাকুর যেখানে বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন, সেইখানে এখনও আমার কিছু বিষয় আশয় ও নগদ টাকা পয়সা আছে, অতএব সেখানে আমাকে যাইতেই হইবে। পিতা

কহিয়াছেন, আমি পুরুষ ছেলে এখানে এ ভাবে বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। এখানে বিদ্যা উপার্জ্জনের কোনও উপায় নাই, অতএব বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জনের জন্য আমাকে ইতিমধ্যে স্থানান্তরে যাইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইতে হইবে।

অনিলের কথা শুনিয়া বালিকার সহাস্য মুখ মলিন হইল, সুনীল নয়নযুগল হইতে জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অনিল। আমি যাইব বটে, কিন্তু আবার আসিব। তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোথাও সুখ নাই। আমার আর কেহই নাই।

প্রভাতী। তুমি গেলে আমরা আর কাহার সঙ্গে খেলিব? পাড়া প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না। তুমি আমাকে বাঁশী বাজাইতে শিখাইয়াছ। তুমি ঠিক্ করিয়া বাঁশী মুখে তুলিয়া না দিলে আমি বাজাইতে পারি না। চন্দ্রকিরণে সুশীতল তারকা-সুশোভিত রজনীতে সুগন্ধিত বনপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে তুমি আমাকে শিখাইয়াছ, শ্যাম লতিকার পাতার তলে তলে ছায়ার মত মিশিয়া মিশিয়া খেলিতে শিখাইয়াছ, জ্যোৎস্না উঠিলেই নদীতীরে আসিয়া বসিতে শিখাইয়াছ। তুমি সঙ্গে না থাকিলে কি আর আমরা এসব কাজ করিতে সাহস পাইব? আর মধুমতীর সঙ্গে অনেক সময় আমার ঐক্য হয় না।

ইহার কিছু দিন পরে বালক বালিকাকে ছাড়িয়া বহুদূর দেশে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, কত কষ্ট, কত অপমান ঘোর তরঙ্গের মত গড়াইয়া গড়াইয়া অনিলের জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কখনও বা দারুণ মিথ্যা অপবাদে অপদস্থ, কখনও বা অকারণে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও দীর্ঘ মেয়াদে কারাবাসী! ঘোর দরিদ্রতানলে দগ্ধ, ভীষণ রোগে মুমূর্ষু, দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত ও বদ্ধ, দারুণ শীতে অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণশীল। এইরূপ অনেকানেক কষ্টে নিপতিত হইয়াও সে পুরুষোচিত ব্যবহার ত্যাগ করিল না। বাল্যকালাবধি তাহার হৃদয়ে প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্য পরিলক্ষিত হইত। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভ তাহার মনে ধ্রুবতারা স্বরূপ হইয়াছিল, সেই জন্য শত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও সে তাহা লাভ করিতে পারিয়াছিল। অবশেষে অনিল নিজের অসাধারণ বুদ্ধিবলে একজন বিলাসী রাজার বিশ্বাসী বন্ধুর পদ প্রাপ্ত হইল ও নানা দেশ বিদেশে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনিল প্রভাতীর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এইরূপ ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারিল যে, অবশ্য ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার পক্ষপাতিনী হইয়াছে। তাহার

পর দিন অনিল রাজার সঙ্গে মহা সমারোহে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইল।

সপ্তম দিবস অতিবাহিত হইল, তবুও রাজার মৃগয়া-পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। কিন্তু অচিরে নির্ম্মলাকাশ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত ও বৃষ্টির সঙ্গে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল, সেনানীদল লণ্ড ভণ্ড হইয়া কে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা রহিল না।

অনিল তখন অশ্বারোহণে অন্ধকারাবৃত মাঠ দিয়া শনৈঃ শনৈঃ গ্রামাভিমুখে যাইতেছিল। এক কুহকিনী আশাই তাহাকে সেই দিকে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, অচিরে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইল। অতএব সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল।

যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন সে দেখিল—রজনী প্রভাত হইয়াছে, শশিকলার ন্যায় অতি সুন্দর পলাশপুষ্প সকল চারি দিকে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। এক রম্য কাননের ভিতর পত্র-পুষ্প-শোভিত তরুলতা-পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে শয্যোপরি সে শায়িত আছে, আনত পুষ্প মুকুট-শোভিত মন্দার তরুরাজি কুঞ্জ আকারে চারি দিকে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নিশীথিনীর কণ্ঠে যেমন নক্ষত্রমালা শোভা পায়, অনন্ত-যৌবন-গৌরবশালিনী প্রকৃতির কোমল কণ্ঠে সুরঞ্জিত পুষ্প-মালিকা সকল তেমনি শোভা পাইতেছে। সে বনের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত চূত-মুকুলাঙ্কুর পরিশোভিত রসাল বৃক্ষনিচয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কুটীরাভ্যন্তরেও রাশীকৃত কুসুমাবলী সজ্জিত আছে। আর সে দেখিল তাহার সম্মুখে নব-বিকশিত যৌবন-ভার লইয়া কে একজন রমণী বসিয়া আছে, তাহার শরীর-সৌন্দর্য্যে চারি দিক্ আলো করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে মুক্ত বাতায়নে অপর একজন রমণী দাঁড়াইয়া আছে। রমণীর মস্তকে আনিতম্ব-লম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ কুণ্ডলীকৃত কবরীরূপে শোভা পাইতেছে। সে অনিলকে জাগরিত হইতে দেখিয়া কহিল "প্রভাতি, দেখ দেখ উনি জাগিয়াছেন। বোধ হয় তোমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তুমি উহার সঙ্গে কথা বল, আমি চলিলাম।" বলিয়া সে রমণী চলিয়া গেল।

মধুমতীর কথা শুনিয়া অনিলের মনের ভাব যে কি রকম হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অনিল দেখিল যে, এই সম্মুখস্থ মনোহররূপা রমণীই তাহার সেই প্রভাতী। সে তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া প্রভাতীকে সাদরে সম্ভাষিল ও প্রেম-চুম্বন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিতে গেল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভাবিতে লাগিল—আজ আমার জন্ম সফল হইল, কারণ আজ আমি হৃদয়ের রাণীকে ফিরিয়া পাইলাম। দেখিতেছি প্রভাতী এখন বড়

হইয়াছে। মলয়-হিল্লোলে যেমন বসন্ত পুষ্প-কোরক প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি নব-যৌবন-ভরে তাহার সৌন্দর্য্যও বর্দ্ধিত। আহা কি মধুর! কিন্তু ইহাকে প্রেম-চুম্বন করিতে আমার কোনও অধিকার আছে কি? আমি কে?।

প্রকাশ্যে কহিল "প্রভাতি! তুমি এখনও কি আমাকে সেইরূপ ভালবাস? আমি তোমাকে এত দিন ছাড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু কত যে কষ্টে,তাহা অন্তর্যামীই জানেন। প্রভাতি! এবার তুমি আমাকে কোথায় পাইয়াছিলে? প্রভাতীর সুনীল নয়ন অশ্রুজলে ছল ছল করিতেছিল, অনিলের মধুর বচনে তাহা মুক্তাহারের ন্যায় ঝরঝর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যে হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য-দেবতা, শত দুঃখে সুখেও যাহার মুখ মনে পড়িত, যাহার বিরহও তাহার নিকট স্বর্গ-সুখ, আজ সেই অনিল তাহার নিকট উপস্থিত। কিন্তু আজ সে অনিলের কথার কোনও জবাব দিতে পারিল না, শুধু মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনিলও অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে প্রভাতী কহিল "যে দুঃখের দিন গিয়াছে, তাহা যাক্, আর যেন সে সময় না আসে। আমি তোমাকে যে অবস্থায় পাইয়াছিলাম, তাহা মনে হইলে এখনো হৃৎকম্প হয়।

অনিল। তুমিই বার বার আমার জীবন রক্ষা করিতেছ। বলিতে বলিতে অনিলের মুখ কৃতজ্ঞতায় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। সে তখন আশ্বাসিতহৃদয়ে কহিল "প্রভাতি! তুমি কি এখনও আমাকে সেইরূপ ভালবাস?"

প্রভাতী মুখ তুলিয়া অনিলের মুখের দিকে চাহিল, অমনি ছোট বুকখানের একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি কম্পিত করিয়া গেল। অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কিছু বলিতে পারিল না, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া আনত-বদনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সেই অধোমুখী প্রফুল্ল-কল্পলতার দিকে তাকাইয়া অনিলের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে মধুর বচনে কহিল "এ অমৃতাধরে এমন বিষময় হাসি হাসিবার অর্থ কি, প্রভাতি?"

প্রভাতীও ছাড়িবার মেয়ে নয়, সেও কালো কেশের রাশি ঈষৎ সরাইয়া সুন্দর গ্রীবাদেশ বামে হেলাইয়া স্খলিত অঞ্চলাগ্র খুঁটিতে খুঁটিতে সুন্দর চোখের উপর চোখ স্থাপিত করিয়া কহিল "দেখ ও অসময়ে বেশী বেয়াদবী করিলে ভাল হইবে না। কাল তুমি কিছু খাও নাই, তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি যাই, তোমার আহারের উদ্যোগ করিগে।"

অনিল হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাস্তবিক আমি বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছি।"

অনিলের কথায় বালিকা কি বুঝিল সেই জানে, কিন্তু সে কথায় সে লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

চুট্‌কি গল্প।

কৃষ্ণ পান্তীর বাঙ্‌নিষ্ঠা।

রাঢ় দেশের "রাহাজানি" ভারত-বিখ্যাত। পথিকগণের প্রাণনাশ করিয়া অথবা তাহাদিগকে মৃতবৎ আহত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করাকে "রাহাজানি" কহে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই ঐ ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইত। হুগলী জেলার অন্তর্গত নাড়িয়া নিত্যানন্দপুরের নিকটবর্ত্তী বগাচণ্ডী-গাছার খাল, চাকদার নিকটবর্ত্তী হেঁড়ের খাল, বঁইচির সন্নিকট গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড ইত্যাদি বহুসংখ্যক স্থানে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও ঐ ভয়ানক কাণ্ডের অভিনয় শ্রুত হইয়াছে।

রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুদিগের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তীর যখন চূড়ান্ত উন্নতির সময় এবং তিনি যখন হাটখোলার কর্ত্তাবাবু এই নামে সুবিখ্যাত, তখন একবার দুর্গোৎসবের পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতে-ছিলেন। তখন রেলপথ ছিল না; কলিকাতা ও রাণাঘাটের মধ্যে জলপথে যাতায়াত করিতে হইত। কৃষ্ণপান্তী যখন পূর্ব্বোক্ত হেঁড়ের খালের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন রজনী উপস্থিত। একদল জলদস্যু (বম্বেটে) তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিল। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সন্ধান লইয়াছিল যে, পূজার সময় কৃষ্ণপান্তী অনেক টাকা কড়ি লইয়া বাড়ী যাইতেছেন এবং তাঁহার নৌকাখানা মারিতে পারিলে লাভের সীমা থাকিবে না। যখন তাহারা নৌকায় উঠিয়া লোক জনের প্রতি প্রহার আরম্ভ করিল, তখন কৃষ্ণপান্তী কহিলেন,

"তোমরা কে? কেন এরূপ অত্যাচার করিতেছ?" দস্যুগণ কহিল,—

"আমরা ডাকাইত, তোমাদিগকে প্রাণে মারিয়া নৌকা লুঠ করিব।"

"তোমরা জান, এ নৌকাখানা কাহার?"

"জানি, হাটখোলার কর্ত্তা বাবুর।"

কৃষ্ণপান্তী কহিলেন,—

"তবে আজ চলিয়া যাও, দ্বাদশীর দিন কলিকাতার গদিতে আমার সঙ্গে দেখা করিও।" দস্যুগণ নীরবে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণপান্তী যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, কখনই আপন কথার অন্যথা করিতেন না, এই বিষয়ে চোর ডাকাইত-দিগেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ইহা বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। নির্দ্দিষ্ট দিনে দস্যুদলের দুই এক জন অকুতোভয়ে হাটখোলার গদিতে গমনপূর্ব্বক কর্ত্তা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে পাঁচশত টাকা দিবার জন্য খাতাঞ্জীকে আদেশ করিলেন।

কোন কোন কর্ম্মচারী কৃষ্ণপান্তীর মুখে আগন্তুকগণের পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার পরামর্শ দিলেন। বাঙ্‌নিষ্ঠ কৃষ্ণপান্তী সে পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া দস্যুগণকে সংকল্পিত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণপান্তীর জীবনে বাঙ্‌নিষ্ঠার ঐরূপ পরিচয় আরও পাওয়া যায়। যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন হরধামের রাজগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র হরধামের "মাসহারা" বন্ধ করেন। হরধামের পক্ষগণ মাসহারা পাইবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া জিলার কোন প্রধান ব্যক্তিকে জামিন চাহিলেন। হরধাম পক্ষের অনুরোধে কৃষ্ণপান্তী ঐ জামিন হইবার জন্য অঙ্গীকার করেন। মাসহারা দিতে ইচ্ছা না থাকায়, ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণপান্তীকে জামিন হইতে নিষেধ করেন। কৃষ্ণপান্তী সেই নিষেধের উত্তরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

আমি মুখ হইতে যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছি, তাহা পুনরায় কিরূপে মুখে লইব?"

যেমন মুখ হইতে থুথু ফেলিয়া তাহা আর মুখে লওয়া যায় না, কৃষ্ণপান্তীর ধারণা ছিল, কোন কার্য্য করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, তাহা আর পরিহার করা যায় না। কৃষ্ণপান্তীর এই উত্তর শ্রবণে নদীয়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার উপর রুষ্ট হন এবং অনেক অত্যাচার করেন। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আপনার বাঙ্‌নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সুখের কল্পনা।

ছি! ছি! ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা—
ঊষার আলোক চুমি ধরাতল,
প্রেম অনুরাগে করে ঢল ঢল,
ফুল বালা চলি অনিলের গায়
সাদরে সোহাগে সুবাস মাখায়;
মিছে এ সকল অলীক বাসনা,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা। ১।

ছি ছি! ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা—
শারদ গগনে বিমল জোছনা,
চকোরী অধীরা প্রেম-নিমগনা,
গোলাপী বসনে প্রকৃতি সুন্দরী
আবেশে মগনা আপনা পাসরি;
মিছে এ সকল অলীক জল্পনা,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা। ২

ছি! ছি! ভুলে যাও সুখের কল্পনা—
সুচারু নয়নে সরলতা মাখা
প্রেমময়ী প্রাণে প্রেমছবি আঁকা,
দেহ প্রাণ মন যা কিছু আমার,
হৃদয় সর্ব্বস্ব—সকলি তোমার;
মিছে এ সকল আশার ছলনা,

ছি ছি ভুলে যাও সুখের কল্পনা। ৩।
ছি ছি! ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা।
'যে সকলে লয়ে করি আমি ঘর,
সকলি আমার নহে কেহ পর,
আপনার স্বার্থ সকলে ভুলিয়া
দিতেছে আমার সন্তোষ সাধিয়া,'
এ শুধু মোহের মোহিনী ছলনা,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা। ৪।
ছি ছি! ভেঙ্গে দাও অলীক কল্পনা।
অবগাহি ভব-সাগরের নীরে,
আবার এখনি দাঁড়াইবে তীরে,
ভুলি সংসারের সুখ আস্বাদন
বিভুপদধ্যানে হইব মগন।
হয়নি সম্ভব, কখন (ও) হবে না,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও অনিত্য কল্পনা। ৫।
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে অসার কল্পনা,
যা কিছু তোমার দেখে চিনে লও,
পথের পথিক এই বেলা হও,
মোহিনী মায়ায় মন্ত্রমুগ্ধ হলে
এত খানি পথ কেবা দিবে বলে?
ক্রমে বেলা যায় এখনও চল না,
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে অসার কল্পনা। ৬।

কোড্রস।

গ্রীস ও তুরস্কের বিগত যুদ্ধ উপলক্ষে প্রায় সকলেই ঐ দুই দেশের ইতিহাসাদি সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক। অদ্য তাই বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাকে গ্রীসের অতি প্রাচীনতম সময়ের একটী বিষয় জানাইব।

গ্রীসদেশটী ইউরোপে। ইহার উত্তর সীমায় তুরস্ক, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্ব সীমায় ইজিয়ান সাগর। গ্রীস দেশটী পর্ব্বত ও সমতল-ভূমিতে পূর্ণ এবং উহার প্রান্তভাগ সমুদয় সমুদ্রশাখা দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। এই গ্রীসের দক্ষিণাংশে লেকোনিয়া নামে এক প্রদেশ ছিল, তাহার রাজধানী স্পার্টা। উত্তরাংশে বিয়োসিয়া প্রদেশের রাজধানী ছিল থিব্‌স। ইহার পূর্ব্ব দিকে 'আটিকা'। এই আটিকার রাজধানী 'এথেন্স'। এই তিনটী নগর গ্রীসের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। দেশের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর।

আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, সে সময় নেপোলিয়ন কিম্বা ওয়েলিংটন ছিলেন না, ধনলোলুপ তৈমুর কিম্বা দারায়ুস ছিলেন না—ছিলেন তখন গ্রীসের প্রজাবৎসল রাজা 'কোড্রস'। প্রজার জন্য যে রাজার হৃদয় কাঁদে না, প্রজার দুঃখে যে রাজা অশ্রুপাত করেন না, স্বদেশের জন্য যে রাজা মরিতে প্রস্তত নহেন, তিনি রাজসিংহাসনের উপযুক্ত নহেন—তিনি কাপুরুষপদবাচ্য। কোড্রস যেমন উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ উচ্চবংশোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত ছিল। তাঁহার যেমন অসীম শারীরিক বল ছিল, তেমনি

মানসিক বলেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তিনি প্রকৃতপক্ষে বীরপদবাচ্য।

মনুষ্যের আশা মিটিবার নহে। রাজ্য-লোলুপ 'ডোরিয়ানগণ' পিলপনিসসে (দক্ষিণ গ্রীসে) রাজশ্রী লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হইল না—এথেন্সের বিজয়লক্ষ্মী কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। ডোরিয়ানগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আশ্রয়-স্থান উত্তর-গ্রীসের কতক স্থান জয় করিয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে এথেন্সের দিকে ধাবিত হইল। উহারা আটিকায় আগমন করিয়া এথেন্সের সন্নিকটবর্ত্তী 'ইলিসস্' নদীতীরে শিবির স্থাপন করিল। এখন ডোরিয়ানদিগের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না; তাহারা ভবিষ্যজয়ের আশায়—এথেন্সবাসীদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার আশায় যেমন বীরদর্পে রণভেরী বাজাইয়া অতুল আনন্দে মত্ত হইল—এথেন্সবাসীরা এবং তাহাদের রাজা বীরেন্দ্র কোড্রস স্বদেশরক্ষার্থে, অকৃতজ্ঞ ডোরিয়ানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বীরসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া গগনভেদী বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া অটলভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে গ্রীসের অধিবাসিগণের ভবিষ্যদ্‌বক্তার উপর অচল বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাতেই তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। ডোরিয়ানগণ এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রসিদ্ধ ডেল্‌ফি তীর্থস্থানে তাহাদের জয় পরাজয় সম্বন্ধে দৈব-আজ্ঞা জানিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাদের হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব আশা ও নিরাশার স্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কখন তাহারা ভাবিতেছে যুদ্ধজয়ী হইলে এথেন্সকে চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিব, আবার তৎপরক্ষণেই বিরূপ ভাব মনে ভাবিতেছিল। আর এথিনিয়ানেরা তাহাদের মাতৃভূমির রক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য চিন্তিত। ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্‌বক্তার নিকট হইতে সংবাদ আসিল "যদি তোমরা এথেন্সের রাজশরীরে কোন প্রকার আঘাত না কর, তাহা হইলে বিজয়ী হইবে।" এ কথায় ডোরিয়ানগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ ভাবিতেছিল যুদ্ধে আসিয়া রাজাকে আঘাত না করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ কিরূপে সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ যদি তাহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত রাজাকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহাদের এত আশা ভরসা সমুদয়ই নিরাশার খর স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে এথেন্সের প্রজাবৎসল রাজা কোড্রস্ এই সংবাদ পাইলেন। ওদিকে যেমন ডোরিয়ান সেনাপতি নৈরাশ্যের বিভীষিকায় ত্রস্ত; এদিকে কোড্রসের মনে তেমনি অতুল আনন্দ। তিনি ভাবিতেছেন আজ আমার জীবন সার্থক; আজ আমার অকিঞ্চিৎকর দেহের বিনিময়ে জন্মভূমির বিজয়-

পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিব, শুদ্ধ আমার জীবনদানে সমগ্র এথেন্সবাসীর জীবন সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে;—তাই তিনি হীরকখচিত সুবর্ণ মুকুট তার মস্তকে ধারণ করিলেন না, বুঝিলেন উহাতে এথেন্সের উদ্ধার হইবে না। মহামূল্য রাজসাজ ত্যাগ করিলেন, কারণ দেখিলেন রাজবেশই বিপদের কারণ হইতে পারে। সেই মহামূল্য রাজবেশ, হীরকখচিত মুকুট, ও উষ্ণীষাদির পরিবর্ত্তে শতগ্রন্থি মলিন বাস, অসির পরিবর্ত্তে সামান্য কৃষক-যষ্টি, সুগন্ধ চন্দনের পরিবর্ত্তে ধূলিরাশি দেহে লেপন করিয়া সামান্য কৃষক সাজিয়া জন্মভূমির উদ্ধারার্থে ডোরীয় শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনৈক সেনার সহিত যুদ্ধে নিহত হন। এই ঘটনা ১০৬৮ পূঃ খৃঃ হইয়াছিল। ঘটনার পর দিন প্রত্যূষে এথেনিয়ানগণ তাহাদের মৃত রাজার দেহ চাহিয়া পাঠাইলেন; তখন ডোরিয়ান্‌গণ কোড্রসের জীবনের সহিত তাহাদের জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ হইলেন।

বর্ত্তমান বীরত্বাভিমানিগণ বলুন দেখি এরূপ শান্তিপূর্ণহৃদয়ে ও শীতলরক্তে মরিবার জন্য কয় জন বীর প্রস্তুত? যদি ডোরিয়ানগণ সে বার কোড্রসের মৃত্যুর পূর্ব্বে যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে জয় সম্বন্ধে কতদূর সফলমনোরথ হইত তাহা বলা যায় না, কারণ যে রাজার হৃদয় সর্ব্বদা স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, স্বদেশের মঙ্গলকামনাই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, যাঁহার হৃদয় প্রজ্বলিত বৈশ্বানর সদৃশ তেজে দীপ্তিমান্, তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ডোরিয়ান্‌দিগের জয়াশা নিতান্ত দুরাশা হইত। আর যদি ডোরিয়ানগণ ভবিষ্যদ্‌বক্তার কথা কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া কোড্রসের মৃত্যুর পর যুদ্ধ করিত, তাহা হইলেও তাহাদের জয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ, কারণ যে দেশের প্রজাগণ দেখিল তাহাদের প্রজাবৎসল রাজা তাহাদের জন্য অকুতোভয়ে প্রাণ বলিদান দিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুদিগকে পরাভূত করিত। এথিয়ান্‌গণ কোড্রসের মৃত্যুর পর ইহাঁর সম্মানার্থে রাজপদ উঠাইয়া দিয়া আর কাহাকেও 'রাজা' উপাধি দিতে স্বীকৃত হইল না। কোড্রসের বংশধরগণই প্রিন্স বা আরকন উপাধি ধারণপূর্ব্বক বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উ, না, ব।

ভাইফোঁটা।

এস ভাই ফোঁটা দিব সুন্দর কপালে !
প্রীতিমাখা, হাসিমাখা,
স্নিগ্ধ পরিমল ঢাকা
চন্দন লইয়া হাতে রয়েছি দাঁড়ায়ে ;
এস ভাই শুভক্ষণে,
আনন্দপূরিত মনে;
সুন্দর চন্দন-ফোঁটা দিইগো পরায়ে।
আজ ভাই ঘরে ঘরে,
আনন্দ-নিঝর ঝরে,
আশা হাসি উথলিত সবার পরাণে;
আজ সমীরে সুরভি বয়,
কুসুম সুরভিময়,
পরিমল বহে আজি বন উপবনে।
ভ্রাতার ভগিনী যারা,
হরষেতে মাতোয়ারা,
আশার হিল্লোল বয় পরাণের তলে ;
সুগন্ধি চন্দন হাতে,
উপহার লয়ে সাথে,
ডাকিছে ভ্রাতারে সবে হাসিভরা গালে—
এস ভাইফোঁটা দিই সুন্দর কপালে।
এস ভাই ফোঁটা দিব সুন্দর কপালে।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধাম,
পরমেশ প্রাণারাম,
সুন্দর মধুর তাঁর এ বিশ্ব ভুবন;
সুন্দর কুসুমরাশি,
মধুর চাঁদের হাসি,
মধুর বিহগগীতি মধু সমীরণ।
মধুর মিলনভরা,
সুন্দর এ বসুন্ধরা,
মধুর সংসার ভাই সুখের আলয় ;
মধুর সুন্দর অতি—
ভ্রাতা ভগিনীর প্রীতি,
মধুর বাঁধনে বিশ্ব বাঁধা সমুদয়।
প্রণমি বিভুর পায়,
সর্ব্বসুখ বিধাতায়,
তাঁহারি এ অতুলন করুণার বলে
আজ এই শুভ দিনে,
হরষ উৎফুল্ল মনে,
চন্দনের ফোঁটা দিব ভাইয়ের কপালে।
এস ভাই ফোঁটা দিব তোমার কপালে!
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে,
বঙ্গে ভগিনীর প্রাণে,
কতনা বাসনা সাধ উঠিছে জাগিয়া ;
সারাটী হৃদয় ভরে,
দেখ আজ থরে থরে,
ভক্তি প্রীতি ফুলরাশি উঠিছে ফুটিয়া।
এস ভাই হাসিমুখে,
ফোঁটা পরাইব সুখে,
সারা বরষের আশা হইবে পূরণ ;
ভক্তিপ্রীতি প্রাণ ঢেলে,
ফোঁটা পরাইয়ে দিলে,
সুদৃঢ় হইবে আরো প্রাণের বাঁধন।
ভগিনীর প্রীতিগুণে,
মরতে স্বরগ আনে,
সুন্দর কুসুম শত ফুটায় শ্মশানে ;
ভালবাসা মধুময়,

সমন দমন হয়,
ভগিনীর স্বার্থহীন ভালবাসা গুণে।
অজ্ঞাত পুণ্যের ফলে,
জনমি এ ধরাতলে,
এই উচ্চ অধিকার লভেছি যখন ;

এস কাছে এস ভাই,
প্রাণে প্রাণে মিশে যাই,
চিরতরে বাঁধি আজি প্রাণের বাঁধন।

শ্রীবনলতা দেবী।

হিন্দু সদাচার।

স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে স্বচেষ্টাসম্পন্ন প্রাণিগণই অতি উত্তম। তদপেক্ষাও সজ্ঞান চেষ্টাশালী জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ জীবগণের মধ্যে মনুষ্যেরা প্রধান। মনুষ্যদিগের মধ্যে বিদ্বদ্‌গণই প্রধান। বিদ্বদ্গণের মধ্যে চরিত্রবান্ সদাচারসম্পন্ন মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান। অতএব মনুষ্য সতত রাগদ্বেষবিরহিত হইয়া জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও সদাচারসম্পন্ন হইবে, তাহা হইলে তাহার আয়ু, স্বাস্থ্য ও সুখ বর্দ্ধিত হইবে। দুরাচার লোকে কেবল পরকালে দণ্ডনীয় হয় তাহা নহে, ইহকালে নিন্দনীয়, সদা ব্যাধিগ্রস্ত, অল্পায়ু এবং দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র হইতে হিন্দু সদাচার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত হইল। আশা করি, ইহা দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

১। যাহা কিছু পরাধীন, তাহা পরিত্যাজ্য, সতত আত্মবশ কর্ম্মই করিবে। যেহেতু পরাধীনতাই দুঃখের মূল, এবং স্বাধীনতাই সুখের হেতু।

২। যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, তাহাই কর্ত্তব্য ; ইতর কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। যম, নিয়মই ধর্ম্মের প্রধান সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মাভিলাষীর যম নিয়মানুষ্ঠানে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

৩। সত্য, ক্ষমা, সারল্য, ধ্যান, অনৃশংসতা, অহিংসা, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, প্রসন্নতা, মধুরতা ও কোমলতা এই দশবিধ যম।

৪। শৌচ, স্নান, তপস্যা, দান, মৌন, যাগ, অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, এবং ইন্দ্রিয়সংযম, এই দশবিধ নিয়ম।

৫। কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এবং লোভ এই ছয় রিপুকে জয় করিলে বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়।

৬। পরপীড়নপরাঙ্মুখ হইয়া বল্মীকস্তূপের ন্যায় ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই পরকালের একমাত্র সহায়।

৭। যে ব্যক্তির রসনা, ভার্য্যা, পুত্র, ভ্রাতা, মিত্র, ভৃত্য ও আশ্রিত বিনয়-

সম্পন্ন, তাহার গৌরব সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া থাকে।

৮। মদ্যপান, অসৎসঙ্গ, পতিবিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, অকালে শয়ন ও পরগৃহে বাস, এই ছয়টী নারীগণের ধর্ম্মভ্রংশের সহজ কারণ।

৯। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ, ব্যঞ্জন ও লবণ রিক্ত হস্তে দিবে না।

১০। লৌহময় পাত্রে করিয়া অন্ন দিবে না।

১১। বাক্যে "দিব" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত না করিলে, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত ঋণ জানিবে।

১২। জ্ঞানী ব্যক্তি বৃথা শপথ করিবে না।

১৩। মণ্ডল করিয়া ভোজন করিবে। ক্রোড়দেশে, পাণিতলে এবং জীর্ণ বস্ত্র, আসন ও শয্যার উপরে ভোজনপাত্র রাখিয়া ও মলাদিদূষিত হইয়া ভোজন করিবে না। পদপ্রসারণ করিয়াও ভোজন অকর্ত্তব্য।

১৪। বেডের ছাতি ভক্ষণ করিবে না। ছেদনাধীন বৃক্ষনির্যাস এবং বৎসহীনা বা স্থানান্তরিত-বৎসা গাভীর দুগ্ধ ভক্ষণে বিরত হইবে।

১৫। অশ্বাদি একক্ষুরবিশেষ্ট পশুর দুগ্ধ এবং উষ্ট্র ও মেষের দুগ্ধ পান করিবে না।

১৬। যাহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা শশক, শজারু, কচ্ছপ, গোধা ও বিজাত পশু পক্ষী ভোজন করিতে পারিবে। যদি দীর্ঘায়ু হইতে চাও, তবে যত্নপূর্ব্বক মৎস্য মাংস ত্যাগ করিবে।

১৭। যে মূঢ় ব্যক্তি কেবল আত্মপুষ্টির জন্য প্রাণিহিংসা করে, সে মহাপাপী।

১৮। সুখৈষী ব্যক্তি পরকে আপনার মত দেখিবে; সুখ দুঃখ নিজের পক্ষে যেমন, অপরের পক্ষে তদ্রূপই বিবেচনা করিবে। পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করিলে, নিজের জন্য পরেরও তদ্রূপ করিবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

১৯। এই জগতে বিনা দুঃখে অর্থাগম হয় না। অর্থহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়াকলাপ না করিলে ধর্ম্মার্জ্জন ঘটে না। ধর্ম্মহীন হইলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুখ সকলের বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি, অতএব যত্নপূর্ব্বক তাহা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

২০। ন্যায়ার্জ্জিত অর্থে পরলোকের কার্য্য করিবে, এবং বিশুদ্ধ কালে ও বিশুদ্ধ ভাবে সৎপাত্রে দান করিবে।

২১। নিজ শয্যা, আসন, শণ, কম্বল সর্ব্বদা শুচি জানিবে।

২২। বলপূর্ব্বক গৃহীত বা চোরহস্তগত হইলেও সতী নারীকে ত্যাগ করিবে না।

২৩। পথ বায়ু দ্বারা এবং দ্রব্য মূল্য দ্বারা শুদ্ধ হয়। জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি, সত্য দ্বারা শুদ্ধি মন বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্মশুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিশুদ্ধি হয়।

২৪। অম্লযোগে তাম্রপাত্র, ভস্মদ্বারা কাংসের ও প্রবাহ থাকিলে নদীর শুদ্ধি হইয়া থাকে।

২৫। পঞ্চগ্রাস গ্রহণ করার পর ঘৃত লইবে না। তিলঘটিত বস্তু, জল, দুগ্ধ, দধি, মধু, শাক, পানীয়, পায়স, ঘৃত, এই সকল দ্রব্যের ভোজনাবশিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে দিবে না। সর্ব্বশেষে দুগ্ধ আহার করিবে।

২৬। অতিথি আসিলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সৎকার করিবে, প্রত্যাখ্যান করিলে গৃহস্থ পাপগ্রস্ত হয়।

২৭। নববিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ, দুহিতা, বালক, গর্ভিণী ও রুগ্ন ব্যক্তিকে সকলের অগ্রে ভোজন করাইবে।

২৮। অনলস ভাবে প্রতিদিন; নিত্য কর্ম্ম যথাশক্তি সম্পন্ন করিবে।

২৯। রাহুগ্রস্ত, উদয় ও অস্তগমনোন্মুখ এবং জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে অবলোকন করিবে না।

৩০। জলমধ্যে আত্মরূপ দেখিবে না। বারিবর্ষণকালে ধাবমান হইবে না। গাভীবন্ধনরজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না ও নগ্নাবস্থায় জলমধ্যে প্রবেশ করিবে না।

৩১। ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কখনও ভোজন করিবে না। বল্মীকাদি প্রাণী বিদ্যমান আছে এতাদৃশ গর্ত্তে কিংবা গমন করিতে করিতে ও দণ্ডায়মান ভাবে অথবা গুরুজনের সম্মুখে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

৩২। মুখ দ্বারা অগ্নিতে ফুৎকার করিবে না। নগ্নাবস্থা নারী কখনও দর্শন করিবে না। অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না।

৩৩। জলমধ্যে বিষ্ঠামূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না। নির্জ্জন বাটীতে একাকী শয়ন করিবে না।

৩৪। নিদ্রিত ব্যক্তিকে অকারণে জাগরিত করিবে না। একাকী দূরপথে চলিবে না, ও অঞ্জলি সহযোগে বারি পান করিবে না। রাত্রিকালে আকণ্ঠভোজন অবৈধ। নৃত্য গীত বাদ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না।

৩৫। চিতাধূম, নবোদিত সূর্য্যের রৌদ্র ও দিবানিদ্রা দীর্ঘজীবনেচ্ছু ব্যক্তির ত্যাগ করা উচিত।

৩৬। ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত ও মস্তক কম্পন, পাদ দ্বারা আসনাকর্ষণ, দন্ত দ্বারা নখ লোমোৎপাটন এবং নখ দ্বারা নখ-চ্ছেদন করা কর্ত্তব্য নহে।

৩৭। শুভাকাঙ্ক্ষায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা কদাচ ত্যাগ করিবে না।

৩৮। অভদ্র ও অধার্ম্মিকদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না।

৪৯। পূর্ব্ববিভব গত হইয়াছে বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, কারণ উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে বিদ্যা কি সম্পদ কিছুই দুর্লভ নহে।

৪০। লোককে সত্য অথচ প্রিয় কথা বলিবে, সত্য অথচ অপ্রিয় বলিবে না; মিথ্যা অথচ অপ্রিয় বাক্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

৪১। কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে

"ভাল" এই কথা বলিবে। লোকের ভালই চিন্তা করিবে।

৪২। রূপহীন, নির্ধন ও নীচকুলোদ্ভব বলিয়া কোনও ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না।

৪৩। বাক্যবেগ, মানসিক বেগ, লোভ, উৎকোচ, দ্যূত, দৌত্য ও আর্ত্ত জনের দ্রব্য দূরে পরিহার করিবে।

৪৪। বৃদ্ধগণকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিবে, তাঁহাদিগের জন্য স্বকীয় আসন ছাড়িয়া দিয়া, নিজে নীচে বসিবে ও গমন-কালে তাহাদিগের অনুগামী হইবে।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(৪০৪ সংখ্যা—১৯১ পৃষ্ঠার পর)

সন্তানগণ জনক জননীকে আত্মীয়-মণ্ডলীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে দেখে, তাহারা ঠিক্ তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারাও পিতা মাতার ন্যায় ভবিষ্যতে গুরুজনে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তির পরিবর্ত্তে বিপরীত ব্যবহার করিবে, সন্দেহ নাই। সন্তানের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী জননী। জননীর কার্য্য ও ব্যবহার সন্তানের জীবনে চিরকাল কার্য্য করে। তিনিই সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের মূলাধার। পিতামাতার চরিত্র অনুসারে সন্তানের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইয়া থাকে। সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ ভারত সন্তান-গণের তাহারাই পিতৃপুরুষ—ভাবী উন্নতির তাহারাই নেতা হইবে। দেশের উন্নতির ভার তাহাদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে। এরূপ চরিত্রবিহীন জনক জননীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা কিরূপে চরিত্রবান্ ও স্বদেশহিতৈষী হইতে সমর্থ হইবে? এরূপ বিচ্ছেদপূর্ণ গৃহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া একতা শিক্ষা করা কখনই সম্ভব নহে। বর্ত্তমান সময়ে গৃহবিচ্ছেদ আমা-দিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। স্বার্থপরতা আমাদিগের পারিবারিক সুখ শান্তি অপহরণ করিতেছে।

গৃহে কোনও অতিথি সমাগত হইলে কোথায় আমরা প্রীতিপূর্ণ অন্তরে তাহার স্নানাহারের জন্য ব্যস্ত হইব, না অতিথিকে গলগ্রহ স্বরূপ মনে করিয়া বিরক্ত হইয়া থাকি। এখন অতিথি-সৎকার একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতিথিও মনে করেন তিনি বিদায় লইতে পারিলে রক্ষা পান।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে স্ত্রীজাতির সম্মানের পরিবর্ত্তে অবমাননা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই চরিত্রহীনতার বিষয় চিন্তা করিলে, প্রাণে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। এমন

কোন্ পাপ আছে যাহার জন্য হিন্দু সমাজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? যে সকল কার্য্যের জন্য লোকেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয় সচরাচর শুনি, প্রকৃত পক্ষে সেগুলি পাপ কার্য্য নয়। মদ্যপান, ব্যভিচার, সতীত্বনাশ, এ সকল পাপ করিলে এখন আর দণ্ড নাই, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না। এই পাপগুলি এখন পুরুষ-জাতির চরিত্রগত হইয়াছে। এগুলি দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রতি সপ্তাহের সংবাদপত্রেই পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, যেখানে সেখানে স্ত্রীজাতির অবমাননার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যে আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে দেবীবৎ সম্মান করিতেন, তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততি এখন যেখানে সুবিধা পায়, সেইখানেই স্ত্রীজাতির অবমাননা করিতে ত্রুটি করে না। এরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়া স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরাবরুদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইতেছে। চতুর্দ্দিকের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া শুনিয়া, তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না। কাজেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা ঝগড়া, বিবাদ, ঈর্ষা ইত্যাদি নীচকার্য্য লইয়া লিপ্ত থাকিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তানগণ জননী সদৃশ জীবন লাভ করিয়া পুনরায় ঐহিকের পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অহো! পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ কোন্ স্বর্গ হইতে কোন্ নরকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ভাবিলে বিষম বিষাদসাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়। যে দেশের পারিবারিক প্রণালী ও সামাজিক নীতি এরূপ কলঙ্কিত ও দূষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেশের সন্তান সন্ততি অথবা সে দেশ কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে না। হায়! হায়! কি পরিতাপের বিষয়! কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে প্রাণ মন শিথিল হইয়া যায়, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। ভগিনি, উঠ, গাত্রোত্থান কর। কর্ত্তব্যসম্পাদনে আর উদাসীন থাকিও না। এমন অত্যুজ্জ্বল আর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এরূপ নীচভাবে জীবন অতিবাহিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে জাতির ললনাগণ বহুগুণ-মণ্ডিতা ছিলেন, যাঁহারা অশেষ কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা জগন্মান্যভূতা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান হইয়া এরূপ অপদস্থ ও মোহাচ্ছন্ন ভাবে জীবন যাপন করা আমাদিগের শোভা পায় না। এস, আমরা ক্ষুদ্রতা, নীচতা প্রভৃতি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হই। জ্ঞান, ধর্ম্ম, সতীত্ব ও স্বদেশহিতৈষিতা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সমকক্ষ হই। পরিবারবর্গের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হই। এস আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া পতিত জাতিকে পুনরায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলি। (ক্রমশঃ)

ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার।

রস্‌কিন বিলাতের একজন প্রধান গ্রন্থকার। চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভাজ্ঞাপক অতি উচ্চ দরের রচনাবলী ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ আদরের বস্তু। রস্‌কিন্ অতি মহৎস্বভাবসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার সাধু ব্যক্তির একটী প্রধান চিহ্ন। রস্‌কিন্ স্বীয় ভৃত্যবর্গের প্রতি সদাই অতি সস্নেহ ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। রস্‌কিনের সুযশে আকৃষ্ট হইয়া কোনও ভদ্র ব্যক্তি একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি সেই সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার ভৃত্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন; —রস্‌কিনের সহিত আমি এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছিলাম। নানা প্রকার সুস্বাদু আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে রেউচিনির অম্বল ছিল; তাহা আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমি বলিলাম, 'এবছর আমি এই প্রথম রেউচিনির অম্বলের স্বাদ গ্রহণ করিলাম। কি চমৎকার হইয়াছে!' আমি রেউচিনির অম্বলের প্রশংসা করাতে রস্‌কিন বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘন্টা বাজাইয়া একটী ভৃত্যকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন "মালীকে ডাকিয়া দেও।" মালী আসিলে পর রস্‌কিন তাহাকে মধুরস্বরে বলিলেন;—'দেখ জেক্‌সন্, তোমার এ সালের প্রথম রেউচিনি বড়ই ভাল হয়েছে; এতে আমি বড় সুখী হয়েছি। আমার বন্ধু মহাশয়ের জন্য তোমাকে রেউচিনির অম্বল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলাম, তিনি তা খেয়ে খুব প্রশংসা কচ্ছেন।" জেকসন্ প্রভুর প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দোৎফুল্লবদনে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বকার্য্যে প্রত্যাগমন করিল।

আমাদের আহার সমাধা হইলে রস্‌কিনের কেটিনাম্নী পরিচারিকা প্রকোষ্ঠস্থ কয়েকটী বাতি প্রজ্জলিত করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে রস্‌কিন্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখুন মহাশয়, আজ পশ্চিমাকাশে সূর্য্যাস্তের বড় শোভা হয়েছে।" রস্‌কিন উত্তর করিলেন, "কেটি, তুমি এ সংবাদ দেওয়াতে তোমার কাছে বড় কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু আগে আমি দেখে আসি; যদি খুব সুন্দর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুকেও লয়ে যাব।" এই বলিয়া রস্‌কিন ছাদের উপর গমন করিলেন। স্বল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "বাস্তবিকই অতি সুন্দর হয়েছে, চলুন

দেখা যাক্।" পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্ব্বত-মালা, তাহার পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার, নির্ম্মেঘ—অস্তগত সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় আকাশমণ্ডলে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রসকিন্ তাহার সৌন্দর্য্যই চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন; আমি কিন্তু রস্‌কিনের মালী ও পরিচারিকার সহিত তাঁহার যেরূপ মধুর সম্বন্ধ দেখিলাম, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম এবং সেই ভাব লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

অন্তঃপুর।

"অন্তঃপুর" নামে একখানি মাসিক পত্রের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এই পত্রিকা বঙ্গীয় রমণীদিগের জন্য এবং ইহার সম্পাদিকা একজন বঙ্গরমণী। ইহার প্রবন্ধ সকলও বঙ্গরমণীদিগের দ্বারা লিখিত হইতেছে এবং দেখা গেল সেগুলি স্ত্রীলোকদিগের বেশ উপযোগী। ইহার লেখা বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে। ৩৭ বৎসর হইল, বামাবোধিনী এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থ প্রকাশিত হইয়া যদিও তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু অন্তঃপুরিকাদিগের হিতসাধন একটী অতি বিস্তৃত কার্য্য এবং বামাবোধিনী চিরকাল সহযোগীর অভাব অনুভব করিতেছেন। অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিলা এই দুই খানি পত্রের অভ্যুদয়ে বামাবোধিনী আশান্বিত হইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের অকাল মৃত্যুতে সেইরূপ শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে "পরিচারিকা" ও "মহিলা" নাম্নী দুই খানি পত্রিকা নারীহিতব্রতে বামাবোধিনীর সহকারিতা করিতেছেন, বামাবোধিনীও তাঁহাদিগের সহিত ভগিনী-স্নেহে আবদ্ধ। "অন্তঃপুর" আবার বামাবোধিনীর উদ্দেশ্যসাধনের বিশেষ সহায় হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই অভিনব পত্রিকার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি প্রার্থনা করি। "অন্তঃপুরের" আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার "বীরাঙ্গনা" প্রবন্ধটীর অধিকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

বীরাঙ্গনা।

রমণী স্বভাবতঃ কোমলা। রমণী-হৃদয় চিরকালই কোমল ও দুর্ব্বল বলিয়া জগতে পরিচিত। কিন্তু এই কোমলপ্রাণা রমণীর প্রাণে যে অসীম তেজ আছে, তাহা প্রকাশ পাইলে জগৎ স্তম্ভিত হয়। যে রমণীর বাহু চিরকাল কবিদের ভাষায়

মৃণালের সহিত তুলিত হয়, সেই বাহু সৎকার্য্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, স্বদেশ-রক্ষার জন্য যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রে পরিশোভিত হইলে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। ইতিহাসে এইরূপ কয়েকটী বীরাঙ্গনার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের বীরত্বে জগৎ চমকিত হইয়াছিল, স্বদেশ ধন্য হইয়াছিল, রাজবংশ পবিত্র হইয়াছিল। রাণী লক্ষ্মীবাই এবং রাণী দুর্গাবতীর নাম এই ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ত্রিপুরার রাজবংশে এইরূপ একটী বীরাঙ্গনার উল্লেখ আছে।

ত্রিপুরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত অতি প্রাচীন ও বিস্তৃত রাজ্য। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত দেশীয় রাজা দ্বারা সুশাসিত ও সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৬৬০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ ছেংথুমফা ত্রিপুরা রাজসিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার রাজ্যে হীরাবন্ত নামে একজন ধনবান্ লোক বাস করিতেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী এবং বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। এই হীরাবন্ত একবার ত্রিপুর-রাজ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য ত্রিপুরা হইতে তিনজন পরাক্রান্ত সেনাপতির অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। সৈন্যগণ হীরাবন্তের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হীরাবন্ত ভীত হইয়া বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঙ্গেশ্বরও হীরাবন্তের সাহায্যের জন্য ত্রিপুর-সেনার বিরুদ্ধে এক প্রবল সৈন্যদল প্রেরণ করেন।

এই সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। মহারাজ ছেংথুমফা স্বীয় সৈন্যদল অপেক্ষা শত্রুসৈন্য প্রবল দেখিয়া যুদ্ধ করিতে অসম্মত হন। রাজমহিষী এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজাকে নানা প্রকারে যুদ্ধে যাইতে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজমহিষী তখন স্বয়ং সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া যুদ্ধসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। বলিলেন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কুলগৌরব রক্ষা করিব। তোমরা প্রস্তুত হও। রাজমহিষীর এই বীরত্বসূচক উৎসাহ-বাক্যে সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন রাজমহিষী সৈন্যসমূহকে মহাসমারোহে ভোজ দিলেন। তৎপর দিন তিনি সেনাপতি ও সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া শত্রুদমন করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৈন্যগণ রাজ্যেশ্বরীর বাক্যে ও কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুদল ভীত ও চমৎকৃত হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ত্রিপুর সৈন্যদল জয়নাদ করিয়া উঠিল। শত্রুগণ পলায়নপর হইল। রাজমহিষী জয়শ্রী সঙ্গে স্বয়ং

রাজলক্ষ্মীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজ্যময় তাঁহার বীরত্বের কথা ঘোষিত হইতে লাগিল। ভারত ইতিহাসে অনেক বীরাঙ্গনার নাম দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। কিন্তু এইরূপ জয়লাভ ও যশোলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং এই ঘটনা ভারত ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল অংশ।

গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠতা।

মহর্ষি মনু আর্য্যজাতির জীবনের যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্ব্বিধ আশ্রম উক্ত হইয়াছে:—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে অন্য ত্রিবিধ আশ্রমের মূল বা আধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা সকলেই গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু এই আশ্রমে থাকিয়াও কিরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া যায়, আমরা তাহা অবগত নহি; যৎকিঞ্চিৎ অবগত থাকিলেও তৎসম্বন্ধে সম্যক্ কর্ত্তব্যপালনে তৎপর ও নিয়মাধীন নহি।

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী এবং স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবার পরিজন লইয়া যথায় বাস করা যায়, তাহাই গৃহ। গৃহী বা গৃহস্থের ধর্ম্মকেই গৃহধর্ম্ম বলা যায়; অর্থাৎ গৃহে নিজের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে ও দেবতা সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য ও নিয়ম, তাহাই গৃহধর্ম্ম এবং এই গৃহধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

স্ত্রীজাতিই গৃহের মূল কারণ। সুতরাং এই আশ্রমের ভাল মন্দ মঙ্গলামঙ্গল পুরুষের উপর অনেক নির্ভর করিলেও বিশেষ ভাবে স্ত্রীজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। গৃহস্থাশ্রমীয় ভক্তি, প্রীতি, সদ্ভাব ও স্নেহ প্রভৃতি দ্বারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। পরিবারের মধ্যে যেমন এই সকলের অভাব হইতে পারে না, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, দয়া, নিঃস্বার্থতা, বিশুদ্ধতা ও সমদুঃখসুখতাদি কতকগুলি গুণ গৃহধর্ম্মের অঙ্গীভূত।

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমরা আদর্শ পরিবার কাহাকে বলি। পরিবারের মধ্যে সুখলাভে অনেক প্রকারে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। শারীরিক অসুস্থতাই সাধারণতঃ প্রধান কারণ। শরীর অসুস্থ থাকিলে কি নিজের প্রতি, কি অপরের প্রতি, কি ইষ্টদেবতার প্রতি, কোনও কর্ত্তব্যই সাধিত হয় না। অসুস্থ ব্যক্তির চিত্তও সচরাচর প্রফুল্ল ও সরলভাবাপন্ন থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহ মনের অতীত যে আত্মা, তৎসম্বন্ধেও কোনও কর্ত্তব্য সাধন ও উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এই রক্তমাংসনির্ম্মিত দেহও আমি নহি, যদ্দ্বারা চিন্তা ভাবনা করি সেই মনও আমি নহি, আত্মাই আমি, এবং সাংসারিক বা শারীরিক সুখ

অথবা ক্ষণিক মানসিক সুখ মানব-জীবনের লক্ষ্য নহে। আধ্যাত্মিক সুখ বা উন্নতিই প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব দেখা যাইতেছে আদর্শ পরিবার গঠিত করিতে হইলে আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ সুস্থতাই একান্ত আবশ্যক। শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের জন্য যেমন নিয়মিত স্নানাহার, রোগের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্যলাভের জন্য যেমন জ্ঞানালোচনা, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও বিবিধ উপায়ে প্রফুল্লচিত্ত থাকা আবশ্যক, আধ্যাত্মিক সুস্থতা লাভের নিমিত্তও সেইরূপ আত্মচিন্তা ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজন। শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা যেমন সহজ, আত্মা পীড়িত হইলে অর্থাৎ সদ্বিষয়ে রুচি ও পাপের প্রতি ঘৃণা না থাকিলে অথবা আত্মা বা ঈশ্বরে উদাসীন থাকিয়া দৈহিক বা সাংসারিক বিষয়সমূহ সার জ্ঞানে তাহাতে লিপ্ত থাকিলে তাহার চিকিৎসা তত সহজ নয়। কিন্তু শারীরিক রোগ নির্ণয় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রোগ নির্ণয় অধিকতর দুঃসাধ্য হইলেও, শারীরিক চিকিৎসা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক চিকিৎসার আবশ্যকতা কোনও অংশে ন্যূন নহে।

আবার—

"রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাং।"

রোগ, শোক পরিতাপ ইত্যাদি আত্মকৃত। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম সকল পালন করিলে ইহাদিগের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিস্তার পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, আদর্শ পরিবার গঠিত করিতে হইলে অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ সুখ লাভ করিতে হইলে বা এককথায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে হইলে গৃহস্থাশ্রমীর কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে।

এই ত্রিবিধ সুস্থতা লাভ পরিবারে বিশেষভাবে রমণীর উপর নির্ভর করে। যে রমণী আপনার এবং গৃহের অপরাপর ব্যক্তিগণের এই ত্রিবিধ কল্যাণ চিন্তায় নিরত, সেই গৃহই প্রকৃত সুখ শান্তি পূর্ণ এবং সেই গৃহের অধিবাসিগণের উন্নতির পথও অধিকতর প্রশস্ত। সুতরাং যে নারী আপনার কি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের এই ত্রিবিধ কল্যাণ ও উন্নতি লাভ সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, আত্মম্ভরিণী, কোপনস্বভাবা ও ধর্ম্মবিহীনা, সেই নারীর গৃহে ক্ষণিক সাংসারিক সুখ যৎকিঞ্চিৎ থাকিলেও তাহা অশান্তিপূর্ণ এবং সেই গৃহস্থ ব্যক্তিগণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভে রমণী সহায় স্বরূপ না হইয়া বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, পুরুষগণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে একান্ত উৎসুক হইলেও গৃহে নারীগণের অজ্ঞতা নিবন্ধন ও ধর্ম্মভাব-বিহীনতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। নারী জাতির কর্ত্তব্য গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি রহিয়াছে। পিতা মাতার প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি ও পুত্র কন্যা

প্রভৃতির প্রতি। রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য পতির প্রতি। সর্ব্ব বিষয়ে পতির প্রকৃত সহচরী হওয়া, জীবনের সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তিতে তাঁহার সহায় হওয়া, পবিত্রতা ও কোমল প্রেম দ্বারা মলিনতা দূর করিয়া তাঁহাকে বিশোধন ও সান্ত্বনা করা নারীজীবনের উদ্দেশ্য।

পতি যেরূপই হউন না কেন, সতী স্ত্রীর পতিই ধর্ম্ম এবং আরাধ্য দেবতা। পতির প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও সম্পূর্ণ অকপটতা থাকা বিধেয়। পতিই তাঁহার সমুদয় হৃদয় মন অধিকার করিয়া থাকেন, সুতরাং অপর পুরুষে কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইতে পারেন না। রামায়ণে লিখিত আছে সীতার সপত্নী থাকা দূরে থাকুক, রাম কখনও অপর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। এই বাক্যটী স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিক শোভা পায়। সতী স্ত্রী ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তিনী এবং অভিন্নহৃদয়া থাকিয়া পতির সুখ দুঃখ—এমন কি মনের প্রত্যেক চিন্তা পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষমা এবং প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিতে যত্নশীলা। যে দ্রব্য, বাক্য, কার্য্য, ব্যবহার বা চিন্তা পতির মনোনীত নহে বা যাহাতে তিনি অন্তরে ক্লেশ পান, সতী নারী বিষতুল্য তাহা বর্জ্জন করিয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে গৃহে স্ত্রীলোক দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষ্যা ও স্বার্থপরতায় নিযুক্ত, আবার যে গৃহে গৃহের শ্রীস্বরূপা স্ত্রীগণ অনাদৃত ও অপমানিত হন, এই উভয় গৃহ হইতেই দেবতাগণ দূরে বাস করেন। গৃহ লক্ষ্মীহীন হইলে যে লক্ষ্মী দূরে পলায়ন করেন, ইহার মর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥"

যথায় পতি পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট এবং পত্নী পতির প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিত্য কল্যাণ নিশ্চিত।

চরিত্রের বিশুদ্ধতা, প্রেম, লজ্জা ও নম্রতা নারীজাতির শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্যক্ রক্ষা করিতে হইলে পাপের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, প্রবল আত্ম-দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন। এমন বিশুদ্ধস্বভাবা কয় জন রমণী আছেন, যাঁহারা বাক্যে, কার্য্যে, ব্যবহারে এবং চিন্তায় কখনও একতিল পবিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হন না এবং ন্যায়ের তুলাদণ্ডে নিরন্তর আপনাদিগকে স্থির রাখিতে সক্ষমা? আমরা যদি বিশুদ্ধতা ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে প্রতিনিয়ত আপনা-দিগকে বসাইয়া রাখি, তবে দেখিতে পাইব যে, যে সকল কার্য্য, বাক্য, ব্যবহার ও চিন্তা আমরা কিছুমাত্র দূষণীয় বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হই না, তাহার মধ্যেই কত জঘন্যতা ও অপবিত্রতা বিরাজ করিতেছে! অতএব আদর্শ চরিত্র লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য প্রতিনিয়ত আপনাকে পবিত্রতা ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে বসাইয়া

রাখা এবং এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইলেই মহা প্রমাদ বলিয়া গণনা করা। যাহার যাহা লাভ করিতে হয়, তাহার তাহা লাভের উপায়সমূহও অবশ্য অবলম্বন করিতে হয়।

তৎপরে প্রেম, লজ্জা ও নম্রতা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই অবগত আছি। গৃহে নারীগণ প্রেম দ্বারা সকলকে বশীভূত, সুশাসিত ও পবিত্র নিয়মাধীন রাখিবেন। কোনও নিয়ম বা সমাজ প্রেম করিতে বাধ্য করে না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই প্রেমেতেই জননী সন্তান প্রতিপালন করেন, পত্নী পতির সেবা করেন, সন্তান পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করেন। রমণী হৃদয়ের এই প্রেমরূপ সুস্নিগ্ধ বারি দ্বারা সংসারের শোক দুঃখ, পাপতাপসমুদায় ধৌত করিবেন। লজ্জা ও নম্রতা নারীজাতির নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু কেবল বাহিরে লজ্জা ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিলেই যে লজ্জাশীলা ও নম্র হওয়া যায়, তাহা নহে; ইহাও অন্তরের জিনিষ। বাহিরে যদি পুরুষ দেখিয়া ৭ হাত ঘোমটা দিলাম, কিন্তু অন্তরালে তাহাদের রূপ, দোষ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ উপহাস, তামাসা ও সমালোচনা করিলাম; বাহিরে মিষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করিলাম, অন্তরালে কুৎসিত আমোদ ও কুৎসিত বাক্যালাপে ঘৃণা ও সঙ্কোচ বোধ না করিলাম, তবে তাহা প্রকৃত লজ্জাশীলতার লক্ষণ নহে। সুতরাং আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে এই সমুদয় কেবল বাহিরের জিনিষ নয়, কিন্তু অন্তরের জিনিষ। অন্তর প্রেম, পবিত্রতা, লজ্জা ও নম্রতা প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিলে বাহিরের ব্যবহার স্বতঃই তাহার অনুমোদিত হইবে। সকল দিক্ বিচারপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, রমণীর ইচ্ছাতেই তাঁহার গৃহ স্বর্গতুল্য হইতে পারে এবং তাঁহার জন্যই আবার সেই গৃহ নরকসদৃশ পাপ ও অশান্তিপূর্ণ হইতে পারে। রমণী গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ লাভের কারণ হইতে পারেন অথবা তাঁহার কারণে গৃহের সকল লোকেই দুঃখ ভোগ করিতে পারেন। শিশু সন্তানগণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্য, কার্য্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া থাকে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। সুশীলা রমণী আপন প্রতিবেশীর প্রতিও আপন কর্ত্তব্য পালনে বিস্মৃত হন না। পরোপকার ধর্ম্মের একটী অঙ্গস্বরূপ। প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে সহানুভূতি করা, সাধ্যানুসারে তাঁহার দুঃখ মোচন করা ধর্ম্মশীলা নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রেমের জন্যই যাহার জন্ম, সেই কোমলপ্রাণা রমণীর প্রাণ কি দুঃখী লোকের দুঃখে কাঁদিবে না? কিন্তু ইহা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহারও উৎকর্ষ করা চাই, কার্য্যে ইহা পরিণত করা চাই। পরকে ভাল বাসিলে—দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার প্রয়াসী হইলে তবে হৃদয় মন প্রশস্ত হইতে পারে।

"সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥"

তৎপরে গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে গৃহে রমণীর সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি সামান্য সামান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিতেও অবহেলা না করিয়া তাহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। গৃহের সুশৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলার জন্য রমণী একমাত্র দায়ী। যে দেশের নারীগণ রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য বিখ্যাত, সেই দেশের রমণীগণ কেমনা সেই সকল কর্ম্ম প্রশংসার সহিত করিতে পারিবেন? রমণী ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমুদয় কর্ম্মই পবিত্র ধর্ম্ম-কার্য্য বা ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া করিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সংসারে নারী-জাতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অতি গুরুতর। নারী যদি ধর্ম্মভাববিশিষ্টা হন, তবে পরিবারস্থ শিশু সন্তানগণ হইতে বয়স্ক সমুদয়ের নারীর ধর্ম্মের দিকে মতি হইবে। তাঁহার ধর্ম্মে তাদৃশ রুচি না থাকিলে অপর সকলের ধর্ম্মভাবও শুষ্ক হইয়া যাইবে। ধার্ম্মিকা ও পতিব্রতা রমণী সম্বন্ধে এইরূপ অনেক আখ্যান আছে যে, পুরুষ চরিত্রহীন হইলে ও নানা প্রকার পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও ধার্ম্মিকা নারী কেবল মাত্র আপনার পাতিব্রত্যের গুণে, সাধুতা ও ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহাকে অধর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া চিরজীবনের জন্য ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিতেছেন। পুরুষের পক্ষে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য যত্নশীলতা যতদূর স্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভব, নারীর পক্ষে তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। সতী নারী যেরূপ অপর সমুদায় বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সমুদায় হৃদয় মন পতিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মপ্রার্থী বা ঈশ্বরপ্রার্থী মানবাত্মা সেইরূপ সমুদায় অনিত্যতা হইতে চিত্তকে একমাত্র ব্রহ্মেতেই অর্পণ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ঋষিগণের উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা গৃহস্থকে তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইতে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে এবং সমুদায় কর্ম্ম ব্রহ্মেতে অর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন।

গৃহে নারী স্বয়ং যেরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য যত্নশীলা থাকিবেন, সেইরূপ অপর সকলেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায় হইবেন। গৃহকর্ম্মে ত্রুটি না করিয়া জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মালোচনায় কিছু সময় দিলে তাহাতে উন্নতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার ধ্যান এবং আত্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য।

জীবনের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উপরে যে সমুদায় বিষয় বর্ণিত হইল, সে সমুদায় সম্যক্ যে গৃহে প্রতিপালিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবার বা আদর্শগৃহ বলা যায়। সুতরাং আমাদিগের চরিত্রকে আদর্শ

চরিত্র, পরিবারকে ব্রাহ্মনিষ্ঠ পরিবার রূপে গঠিত করিতে হইলে এই সমুদায় ধর্ম্ম-নিয়ম যথাবিধি পালন করিতে হইবে।

কি হিন্দু কি অহিন্দু জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলের পক্ষেই এই নিয়ম। যিনি জীবনের এই সমুদায় কর্ত্তব্য সম্যক্ সাধন করিতে পারেন, তিনি যে সমাজ-ভুক্তই হউন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে ও ধর্ম্ম লাভে তিনিই সমর্থ, নতুবা কেবল হিন্দু, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নাম লওয়ায় ফল কি?

জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে আমাদের বঙ্গীয় রমণীকুলের হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক এবং ঈশ্বর করুন জাতি পদ নির্ব্বিশেষে সমুদায় মানব জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সত্য লাভে সমর্থ হউক।

স—বা—দেব, দেরাদুন।

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

বর্ত্তমান রাজাবাড়ীর দক্ষিণ দিকে 'মাটিভাঙ্গা' নামক একটী ছোট পল্লী দেখিতে পাইবে। গ্রামে অল্পসংখ্যক লোকের বাস, তন্মধ্যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত অধিকাংশই নীচ-জাতীয়। উক্ত পল্লীর অগ্নিকোণে একটী তৃণাচ্ছাদিত ছোট কুটীর দেখিতে পাইবে, দেখিবামাত্রই উহা দীন দরিদ্রের আবাস বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে; প্রকৃত পক্ষেও উহা এক ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাসগৃহ।

(২)

সুন্দর গ্রীষ্মের প্রভাত। প্রতি দিনের প্রভাতের মত আজও প্রভাত মনোরম। তেমনি সুশীতল বাতাস, তেমনি চাঁপা ও গন্ধরাজের দিগন্তব্যাপী সুবাস, তেমনি সর্ব্বজন-প্রীতিকর পাখীর সুস্বর, তেমনি মধু-আহরণ-রত মৌমাছিদিগের মধুর ঝঙ্কার। সকলি সুন্দর, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সকল মানবকে সমান সুখী করিতে পারে না।

সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে দরিদ্র ব্রাহ্মণদম্পতী পুত্র কন্যা দু'টী লইয়া বিষণ্ণমুখে আপনাদের ভগ্ন কুটীরে বসিয়াছিলেন, অন্নকষ্টে তাঁহারা নিতান্ত শীর্ণদেহ ও পীড়িতহৃদয় লইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। আজ ঘরে কিছুই খাদ্য নাই, বেলা বাড়িতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিশু দু'টী যখন খাবার চাহিবে তখন কি করিবেন এই দুঃসহ ভাবনায় জননী অত্যন্ত কাতরা হইতেছিলেন, তাই সে প্রভাতের সৌন্দর্য্য তাঁহার দ্বিগুণ কঠোর বোধ হইতেছিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল, শিশুগুলি ক্ষুধায় অধীর হইয়া কান্না ধরিল। মাতা অনন্যোপায়; কেবলই রোদন করিতেছিলেন, কিন্তু কেবল তাঁহার সেই অশ্রান্ত অশ্রুজল তাঁহার সেই অপরিমেয় দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইল না।

পিতামাতা শিশুদিগকে শান্ত করিবার জন্য বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তি না হইলে তাহারা শান্ত হইবে কেন? বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কাতর ক্রন্দন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পিতা ম্লানমুখে অল্প দূরে বসিয়াছিলেন। সন্তানের এই কষ্ট জননীর হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা দিতেছিল, তিনি বহু চিন্তায় অন্ন সংগ্রহের সুযোগ উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"তোমার গৃহে আসিয়া আজীবন কেবল দুঃখই সহ্য করিলাম, সুখ কি তাহা কখনও জানিলাম না, আর কখনও যে এ দুঃখের অবসান হইবে এমন আশাও করা যায় না। আজ আমার গৃহে এমন কিছু নাই যাহাতে দুটী শিশুর ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারি। আমি অবলা স্ত্রীলোক, শতছিন্ন বস্ত্রে গৃহের বাহির হইতে পারি না। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাই অতি ঘৃণার্হ দাসাবৃত্তিও আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এখন ইহারা অন্নাভাবে মারা পড়িবে ইহা কি চক্ষে দেখা যায়!"

এইরূপ গঞ্জনাতে ব্রাহ্মণের মনস্তাপ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি বলিতেছিলেন "দেখিতেছ যখন আমি বহু চেষ্টাতেও আমার এ দুর্গতি নিবারণ করিতে পারিলাম না, অর্থলাভের সুপথ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না, আমি প্রতিকার্য্যানুষ্ঠানেই দেখিতেছি যে তোমাদের দুঃখ দূর করা আমার ক্ষমতার অতীত, তখন আমার দুঃখ পাওয়াই যেন ভগবানের অভিপ্রায়, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষের শক্তি কোথায়?" পত্নী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নানারূপ কঠোর বাক্যে ব্রাহ্মণের যাতনা জ্বলন্ত ও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন—উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "এই আমি অর্থের অন্বেষণে বাহির হইলাম, তাহার সন্ধান না পাইলে আর ফিরিব না।"

৩

সম্বৎ ৪৮ হইতে ৫৩ বৎসরের মধ্যে যে সকল পথযাত্রী হিমালয়ের উপত্যকাভূমি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন—হিমালয়ের নিম্নতর শৃঙ্গে এক নিমীলিত-নেত্র ধ্যাননিরত কঙ্কালাবশিষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি তাহাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সেই অনাবৃত দেহটী দেখিলেই তাহাকে নিতান্ত কৃপা-পাত্র দীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইত। সেই কোটরস্থিত চক্ষু ও স্থির মুখমণ্ডলে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছায়া অঙ্কিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও যোগীর শরীরের শ্রী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল, দেহটী নিতান্ত রুক্ষ ও অস্থিসার দেখাইতেছিল, তথাপি যদিও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তবে অনুমান করিতে পারিতেন যে, যোগিবর অদ্যাপি ৪৮ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন নাই এবং এক সময়ে তাঁহার শরীর সবল ও সুঠাম

ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, তিনি রাত্রিকালে ফল মূল আহার করিতেন এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যোগনিরত থাকিতেন। তপস্বী কত যুগ বা কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ কঠোর যোগসাধন করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া কেহ নির্ণয় করিতে পারিত না। পথিকেরা নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহারই নিকট দিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া যাইত। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, শ্বেত তুষারাবৃত হিমসিক্ত দুর্গম পর্ব্বত-প্রদেশে বসিয়া তাঁহার তপশ্চারণ করিবার একনিষ্ঠ আগ্রহ ও প্রাণগত যত্ন দেখিয়া পথিকেরা বিস্ময়ে মগ্ন হইত।

৪

তপস্বী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সাধনার সময় প্রাণপণ দৃঢ়তার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আজ সে নিরূপিত দিন শেষ হইয়া শেষ দিনের প্রভাত আসিয়াছে। আজ সকলি সুন্দর দেখাইতেছে। লতা পাতা ফুল ফল অতুল সৌন্দর্য্যভরে আন্দোলিত হইয়া উষা দেবীর অভ্যর্থনা করিতেছে—পাখি-কুল এ মধুর সময়ে মধুর ভাবে তাঁহারি মধুর আবাহনসঙ্গীতে উপত্যকাভূমি জাগাইয়া তুলিতেছে। তখন সুবাসবাহী শীতল বায়ু বার বার গা ছুঁইয়া তাঁহাকে আশার মধুর বাণী শুনাইতেছিল। তিনি এ মনোরম মাধুর্য্যের মধ্যে আরাধনা সমাপনে অভীষ্ট দেবতার চরণ কামনা করিতেছিলেন।

যোগিবর ধ্যানভঙ্গের পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—জগজ্জননী ভগবতী তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিদিব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি আরাধ্যা দেবীকে নিকটে দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বলহৃদয়ে দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। দেবী জননীতুল্য সস্নেহ মধুর বাক্যে বলিলেন "বৎস! তুমি কি জন্য এই কঠোর সাধনা করিতেছ বল, আজ আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আসিলাম।" ক্ষণকাল যুবকের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দেবী পুনশ্চ বলিলেন, "বাছা, তোমার আন্তরিক অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর।" যোগী বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ! আপনি অন্তর্যামিনী, জগতের প্রত্যেক মানবের প্রতি-দিনের সুখ দুঃখ আপনি পরিমাণ করিতে-ছেন, এই বিশাল বিশ্বসংসারে আপনার অবিদিত কোথাও কিছু নাই। আমি নিতান্ত দীন, দরিদ্র, অন্নকষ্টে কাতর। এ অবস্থায় জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা-মাত্র, আমার এ দুর্দ্দশা দূর হইবার উপায় বলিয়া দিন।" ভগবতী বলিতে লাগিলেন "বাছা তুমি নিরাশ হইও না, গৃহে ফিরিয়া যাও এবং আমার উপদেশ মত কার্য্য কর, অচিরে তোমার দুঃখের অবসান হইবে। তোমার গৃহে অলক্ষীর আবাস, তাই তোমার দরিদ্রতার শেষ হয় না। তুমি

প্রথমতঃ একটী অলক্ষ্মী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে ভাণ্ডারগৃহে স্থাপিত করিবে, পরে তাহাকে তথা হইতে অপসৃত করিয়া তথায় লক্ষ্মীদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যহ ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা করিবে।

"তোমার বাসস্থানের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ সহর, তথায় অনাথনাথ রায়ের সুবিখ্যাত হাট, সেখানে সপ্তাহে ২ বার মাত্র হাট হয়। তাহার নিয়মাবলী দূর এবং নিকট পল্লীবাসী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছে। অলক্ষ্মীমূর্ত্তি তোমার ভাণ্ডারগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া উক্ত হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইবে এবং বলিবে ইহার মূল্য ২০০ টাকা, কদাচ ইহার কম মূল্যে বিক্রয় করিবে না।" উপদেশ দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

(৫)

অল্প ব্যবধানে উল্লিখিত জমিদারের সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা; তাহার মনোহর শ্বেত চূড়া বহু দূর হইতে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পরোপ-কারী, ধার্ম্মিক, খ্যাতনামা অনাথ নাথ রায়কে বালক বৃদ্ধ যুবক রমণী সকলেই চিনিত।

অনাথনাথ রায়ের কিছুই অভাব ছিল না। কারুকার্য্য-খচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, অপর্য্যাপ্ত ধন, অগণিত বন্ধুবান্ধব পূর্ণ বৃহৎ পরিবার, অসংখ্য দাস দাসী। বাহিরে বহু তেজীয়ান হস্তী অশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জাজ্বল্যমান পরিচয় দিত। গোয়ালে অনেক দুগ্ধবতী গাভী থাকিত। সুন্দর পোষা বিলাতি কুকুরগুলি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। স্থূলকায় শুভ্র পোষা বিড়ালগুলি মকমলের মত কোমল গা'টী লইয়া অসঙ্কোচে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসিত। প্রতি কক্ষে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার উপযুক্ত প্রভূত পদার্থ বিন্যস্ত দেখা যাইত। কোথাও বা যুঁইফুলের মত মনোহর বিলাতি ইঁদুরগুলি, কোথাও বা গৃহপালিত ক্রীড়াশীল সুন্দর শশকপুঞ্জ প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরিত। পালিত পাখী সকল কেহ বা শীস, কেহ বা গান ধরিয়াছে, কেহ বা অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলিতেছে। সকলের উপরে স্নেহময়ী জননী, ভগিনী ও সাধ্বী পত্নী।

(৬)

তাঁহার সমস্ত সুখময় জীবনের উপর দিয়া কে যেন একটী সুগভীর দুঃখ-রেখা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে; এ অতুল বিভবের মধ্যে কিছুতেই তাঁহার সে অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইত না। অনাথনাথ রায় নিঃসন্তান। একটী সন্তানের অভাবে তাঁহার নিকট জগৎ সংসার ঘোর মরুভূমি সদৃশ কঠোর বলিয়া অনুভূত হইত। তিনি সতত বিমর্ষ ভাবে থাকিতেন এবং সংসারে অত্যন্ত বীতস্পৃহ ছিলেন। ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্রজাদিগকে পুত্র-বাৎসল্যে পালন করিতেন, কেহ কোন রূপ অকারণে কষ্ট পাইতেছে কিনা সে দিকে তাঁহার জাগ্রৎ দৃষ্টি থাকিত।

কিরূপে স্বদেশীয় লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি সমস্ত মনপ্রাণ, সমস্ত সময়, সমস্ত অর্থ অকাতরে অজস্র ভাবে কেবলি পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন তাঁহার মাথায় কত শত দীন দুঃখীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত সংখ্যা করা যায় না। বাস্তবিক তাঁহার মত এমন স্নেহশীল, মিষ্টভাষী, সত্যনিষ্ঠ, বিনীত লোক সচরাচর দেখা যাইত না।

(৭)

সন্নিকটে কোথাও হাট না থাকায় নিকট পল্লীবাসী জনসাধারণ, বিশেষতঃ গরীব দুঃখী লোকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিত। অনাথ নাথ রায় সেই অসুবিধা নিবারণার্থ আপন কাছারি-সন্নিহিত প্রান্তরে একটী হাট সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। "উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট কোনও জিনিষ হাটে বিক্রয় করিতে গিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে না, কি কি দ্রব্য অবিক্রীত রহিয়াছে, হাট ভাঙ্গিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জমিদারের প্রেরিত লোক যাইয়া তাহা অনুসন্ধান করিবে ও সেই সেই দ্রব্য উচিত মূল্যে খরিদ করিয়া সরকারি ভাণ্ডারগৃহে অর্পণ করিবে, সেই হাটের এইরূপ নিয়ম ছিল।

(৮)

আজ অনাথনাথ রায়ের হাটে লোকে লোকারণ্য। চারি দিকে অসংখ্য বিক্রেতা নানাবিধ দ্রব্য লইয়া বসিয়াছে। এই ঘন জনতা ভেদ করিয়া এক ব্রাহ্মণ একটী প্রতিমা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। প্রতিমার মুখখানি সম্পূর্ণ কালীমাখা, সর্ব্বাঙ্গে স্থানে স্থানে কালীর রেখা, কপালে দীর্ঘ রক্তের ফোঁটা, বিকট বিভৎস আকৃতি। এই কদর্য্য প্রতিমা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াকুল হইল এবং ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিল না। কেহ কেহ মূল্য জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিয়া বলিলেন, "ইহার মূল্য ২০০ টাকা।" শুনিয়া সকলেই তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া ঠিক্ করিল এবং উপহাস করিতে লাগিল। কেহ বলিল "ঠাকুর! আর কিছু দাম কমাও, আমি এ সুন্দর প্রতিমা লইতেছি।" কিন্তু ঠাকুর কোন মতেই দর কমাইতে স্বীকার পাইলেন না, তিনি কাহারো বিদ্রূপে কর্ণপাত না করিয়া অটল ভাবে প্রতিমা লইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে সমস্ত বিক্রেতা ও খরিদদার চলিয়া যাইতে লাগিল; তখনও ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন, যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমিদারের প্রেরিত লোক হাটে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। সে এই কদাকার অলক্ষীমূর্ত্তি ও তাহার অতিরিক্ত মূল্য শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিল 'যে অলক্ষীর মুখ কেহ দেখে না, তাহাকে কোন্ সাহসে এত মূল্য দিয়া খরিদ করি।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আনুপূর্ব্বিক

সকল ঘটনা অনাথনাথ রায়কে লিখিয়া আদেশ চাহিয়া পাঠাইল। তিনি উত্তরে লিখিলেন "ইহা অলক্ষ্মীমূর্ত্তি হইলেও চিরন্তন প্রথানুসারে ইহা খরিদ করিতে হইবে।" ভৃত্য প্রতিমা খরিদ করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত করিল, অনাথ প্রতিমা নিজ গৃহ মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

(৯)

কালের অপার মাহাত্ম্য! আজ অনাথের সে সুরম্য প্রাসাদ কোথায়? তাঁহার সে অগণিত দাস দাসী, সে হস্তী অশ্ব কোথায়? এখন সেই সযত্ন-পালিত কুকুর বিড়াল, সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ, সে ঐশ্বর্য্যের কিছুই নাই। সেই দীন-পালক অনাথও এখন একজন দীন! এক কদাকার কুটীর এখন তাঁহার বাসস্থান।

ভগবন্! আপনার মহিমার কে অন্ত করিতে পারে? অনাথ দ্রুতবেগে সমস্ত গুলি দুঃখের ধাপ বাহিয়া নীচে নামিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সেই ভীষণ দুঃসময়ে তাঁহার অবিচলিত নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া মনুষ্যমাত্রেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল। সে সময়ে তাঁহার দুঃখের সান্ত্বনা করিবার একমাত্র সহায় ছিল সাধ্বী অনুপমা দেবী। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী প্রত্যহ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রাণে বল পাইতেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় কষ্ট বহন করিতেছেন মনে করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ফলতঃ সংসারের এই প্রবল তরঙ্গাঘাত সে ধার্ম্মিকা দম্পতী ভীম বলে সামলাইয়া উঠিতেছিলেন।

(১০)

বর্ত্তমান সময়ে একবার সে ব্রাহ্মণ দম্পতীকে দেখিয়া আসি। এখন সে হা হুতাশ, সে দীনতা, সে বিষণ্ণতা কিছুই নাই। সুসময় পাইয়া জননী-হৃদয়ের লুপ্তপ্রায় গুণগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তিনিও সাধারণের মত সুযোগ্যা গৃহিণী ও শিক্ষানিপুণা জননী।

(১১)

অষ্টমীর চাঁদ ধীরে ধীরে উঠিয়াছে; সুন্দর মেঘশূন্য রজনী। অনাথ শীতল বাতাসে বাহিরে একান্তে ভগবানের সৃষ্টিমহিমা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী তাঁহার দেউড়ী লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেখিলেন—রমণী অসামান্যা লাবণ্যময়ী, মনোহর রত্নালঙ্কারে ভূষিতা সুদীর্ঘ সিঁথি সিন্দূর-মাখান। দেউড়ি আলোকিত করিয়া ধীর গমনে চলিয়াছেন। তাঁহার সস্নেহ অচঞ্চল দৃষ্টি, অনাথ দেখিয়া বিস্ময়াকুল হইলেন। নিকটে যাইয়া সবিনয়ে কহিলেন, "দেবি! আপনি কে? এবং কি কারণে কোথায় যাইতেছেন, দয়া করিয়া প্রকাশ করুন।" লক্ষ্মীদেবী সুকোমল করুণার্দ্রস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! আমি এত কাল তোমারি গৃহ-লক্ষ্মী ছিলাম, তোমারি পূজা পাইয়াছি ও কল্যাণ কামনা করিয়াছি। তুমি ইতিমধ্যে এ অলক্ষ্মীকে গৃহে স্থাপনা করিয়াছ। যেখানে অলক্ষ্মী, সেখানে লক্ষ্মী কখনও তিষ্ঠিতে পারেন না।"

লক্ষ্মীদেবী পর্লকের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন, অনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে অনাথ দেখিতে পাইলেন —শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অসাধারণ-তেজঃ-পুঞ্জ এক পুরুষমূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছেন। অনাথ সভয়ে নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! আপনি কে? এবং কি অপরাধে আমার গৃহ ত্যাগ করিতেছেন?" নারায়ণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে অনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি এত কাল তোমারি গৃহদেবতা ছিলাম, আজি লক্ষ্মী তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং লক্ষ্মীহীন গৃহে আমি কিরূপে থাকিতে পারি? বলিতে বলিতে নিমেষ-মধ্যে চক্ষুর অন্তরাল হইলেন। অনাথ নারায়ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে; কিন্তু অলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলেন না।

১২

তৎপর দিবস রাত্রিতে দেউড়ি অভিমুখে অত্যন্ত কোলাহল শুনিতে পাইলেন, নানা প্রকার জন্তুর নিনাদে বহির্দ্দেশ শব্দায়মান, তাহাতে একটা মহা ব্যাপার উপস্থিত। অনাথ বহির্গত হইয়া দেখিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেবদেবীগণ স্ব স্ব বাহনে চড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। অনাথ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? তখন প্রথমে সর্ব্বসংহারকর্ত্তা শিব তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "বম্ বম্! নারায়ণ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা নারায়ণশূন্য গৃহে থাকিতে পারি না, অতএব আমরাও চলিলাম।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনাথ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোনরূপ উদ্বেগের লক্ষণ দেখা গেল না।

১৩

বাস্তবিক অনাথ ও অনুপমার তৎকালীন নিশ্চিন্ত প্রসন্ন ভাব দেখিয়া তাঁহাদের যে কোনও অসুখ বা অভাব ছিল ইহা কেহ সহজে অনুমান করিতে পারিত না। আত্ম-প্রসাদ রূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রত্যহ ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাঠাইতেন, বুঝি তাহা পান করিয়াই উঁহারা এরূপ তেজীয়ান্ ছিলেন।

১৪

অনুপমা দেবী চিরজীবন সুখ শান্তির ক্রোড়ে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন। বড় ঘরের কন্যা, জমিদারের গৃহিণী, অভাব কাহাকে বলে জানেন না। তিনি কিরূপে অকাতরে অক্ষুণ্ণহৃদয়ে এ গুরুতর দারিদ্র্য-দুঃখ বহন করিতেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বিশেষ কঠিন হইবে না। তাঁহার সে অসাধারণ দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা অমূল্য সুখ নিহিত ছিল যে, তাহার প্রসাদে তিনি অনায়াসে দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার নিশ্চয়ই এমন একটী লাভ ছিল, যাহাতে বর্ত্তমান

জীবনের সমস্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইতেছিল। এমন একটী শান্তির উৎস তাঁহার চোখের কাছে বহিতে ছিল—এমন একটী আশার প্রদীপ তাঁহার বুকের কাছে জাজ্বল্যমান ছিল—এমন একটী প্রেম-নির্ঝরিণী তাঁহার পায়ের কাছে অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছিল, যাহার মধুর কুলু কুলু তানে বিভোর থাকিয়া তিনি সংসারের দুঃখ গণিবার অবকাশ পাইতেন না। অনাথের ধর্ম্মে বুঝি অন্নপূর্ণা অনুপ্রাণিতা। সেই দুর্গম মলিন কক্ষেও তাঁহার রাণীত্বের অভাব ঘটিয়াছিল এমন মনে হয় না।

১৫

এক পক্ষ পরে পুনরায় এক রাত্রিতে অনাথ দেখিতে পাইলেন, এক পরম জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ দ্রুতগতিতে তাঁহার সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার চারিটী বিলম্বিত দীর্ঘ বাহু; মস্তকে সুদীর্ঘ জটারাশি লম্বমান; সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি শ্বেতচন্দনে বিলেপিত; গলদেশে শুভ্র যুঁই ফুলের মালিকা; সেই মনোহর পুষ্পের সুরভি বায়ুতাড়িত হইয়া বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। সর্ব্ব-প্রীতিকর দেবদেহ, তাঁহার স্নেহ-করুণ নয়নে প্রেম-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। অনাথ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিয়া সন্নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আপনি কে? আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া কি উদ্দেশে কোথায় চলিয়াছেন?" ধর্ম্ম সুমিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! আমি ধর্ম্ম; এত কাল তোমার গৃহে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিলাম, এখন নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমিও চলিলাম"। ধর্ম্মের বাক্য শেষ হইলে অনাথের মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখা গেল। ভক্তি-ভাবে ধর্ম্মের চরণে প্রণত হইলেন। বলিলেন, "প্রভো! তুমি কি বলিতেছ! অন্যান্য দেবগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে জন্য তুমি তো যাইতে পার না। দেখ, আমি কেবল তোমারি জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছি, তোমারি রক্ষার জন্য সমস্ত বিভবে, সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, তুমি কোন মতেই যাইতে পার না।" অনাথের বাক্যে ধর্ম্ম লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবন আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক"। ধর্ম্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় অনাথের কদর্য্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনাথ নিশ্চিন্তমনে কুটীরে ফিরিয়া নিদ্রিত হইলেন।

১৬

এ অবস্থায় বহু দিন কাটিল। একদিন গভীর রাত্রে ছাদে গুরু বস্তু পতনের শব্দে অনাথ জাগিয়া উঠিলেন, এবং তথ্যানুসন্ধানে ছাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন,—নারায়ণকে বহন করিয়া বিরাট পক্ষী গরুড় উপস্থিত। বিশাল-

সেই অতুল-তেজঃপুঞ্জ নারায়ণ স্বয়ং নিকটে। অনাথ যুক্তকরে বলিলেন, "দেব! কি মনে করিয়া আবার অধমের গৃহে আসিয়াছেন?" নারায়ণ প্রীতিপ্রফুল্ল-মুখে উত্তর করিলেন "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" —ধর্ম্ম তোমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমি কি ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে পারি? যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহার সকলি আছে।"

পর দিবস রাত্রিতে অনাথ পেচকের কর্কশস্বরে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন লক্ষ্মী দেবী আবার আসিয়াছেন। অনাথের প্রাণের আনন্দ চক্ষুতে প্রকাশ পাইতেছিল। সস্মিতমুখে বলিলেন, "মাতঃ! আবার কি কারণে আমাকে দয়া করিতে আসিয়াছ?" লক্ষ্মী দেবী বলিলেন "নারায়ণ তোমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমি কি নারায়ণ হইতে দূরে থাকিতে পারি?" অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেবতাগণ আবার অনাথের গৃহে আসিয়া পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন। অনাথ একটীমাত্র কথা না বলিয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার আনন্দ ভাষার অতীত। দেবগণ একবাক্যে বলিতেছেন,—"দেখ অনাথ! আমরা বিনা আহ্বানে তোমার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম! যেখানে স্বয়ং ধর্ম্ম, যেখানে নারায়ণ, সেখানে আমাদের আগমন অনিবার্য্য।"

১৭

অনাথ প্রেম-বিহ্বলহৃদয়ে সকল মঙ্গলের আধার ভগবানের চরণধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সে ভক্তি-মাখা মূর্ত্তি হইতে শত ধারে সৌন্দর্য্য ক্ষরিতেছিল, নিমীলিত নেত্রপ্রান্তে প্রেম অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল বহুকাল পরে আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাণের মধ্যে পাইয়াছেন, যেন সে সুখ হারাইবার তাঁহার একটা বড় ভয় ছিল। যেন তাঁহার মুখে নীরব ভাষা গাহিতেছিল—

"আমি ডুবিতে গেলাম প্রেম সাগরের তীরে,
ভাসি উঠি বারে বারে।
(এবার) আমার জন্মের তরে, প্রেম সাগরে
তুমি ডুবাও দয়া করি হে।"

যদি কোন কঠোরহৃদয় নাস্তিকের ভাগ্যে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন ঘটিত, তবে বিনা তর্কে, বিনা উপদেশে নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইয়া ভগবানে বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া উঠিত। তাহার ঔদ্ধত্য যাইয়া নম্রতা আসিত, অনাস্থা যাইয়া বিশ্বাস আসিত।

১৮

অনাথের পূর্ব্বতন সমস্ত বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন তাঁহার সে দেবচরিত্রের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে না। তেমনি বিনীত, সেই চিরন্তন ধীর গম্ভীর অশিথিল সংযত প্রকৃতি। তেমনি প্রীতিপ্রসন্ন মুখ, ব্যক্তিমাত্রেরই আশ্বাসদায়ক। সে প্রসন্নতার ন্যূনাধিক্য নাই। আর তাঁহার গৃহিনী অনুপমা দেবী, তিনিও সম্পূর্ণরূপে অনাথের সহধর্ম্মিণী। তাঁহারও এখন পূর্ব্ব হইতে সেবা-ভক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয় না—সেই অমায়িক স্নিগ্ধ প্রশান্ত চিত্ত, তেমনি পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়!

১৯

এখন তাঁহাদের বিত্ত বিভব আত্মীয় কুটুম্ব যথেষ্ট হওয়াতে সেই সীমাবিশিষ্ট কর্ত্তব্যভার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই এখন তাঁহাদিগকে সমধিক বিনীত, চিন্তিত ও সতত প্রার্থনাপরায়ণ দেখা যাইত।

এ গল্পটী রূপক হইলেও ইহার মধ্যে মহা সত্য আছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, উচ্চ নীচ পুরুষ রমণী প্রত্যেকেরই অনাথের মত চরিত্রলাভ একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনাথের চরিত্র দেখিবার মত বিষয়, শুনিবার মত কথা। অনুকরণ করিবার মত দৃষ্টান্ত।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

সবিরাম জ্বর।

ভাঁটপাতা চূর্ণ এক আনা মাত্রায়, জলসহ সেবন করাইলে সবিরাম জ্বর নষ্ট হয়।

৪।৫ তোলা হাতি শুঁড়োর পাতা থেতো করিয়া বস্ত্রে পুটলী বন্ধন পূর্ব্বক জ্বর আসিবার ৫।৬ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে নিয়ত ঘ্রাণ লইলে পালা জ্বর আইসে না।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর।

লক্ষণ—ক্লেদপূর্ণ মুখ, এবং মুখে তিক্তত্য, তন্দ্রা, মোহ, কাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কখন দাহ, কখন শীত, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে লক্ষিত হয়, তাহাকেই পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বলে।

অমৃতাষ্টক পাচন—গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কটুকী, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা, ইহার পাঁচন, ॥০ তোলা পিপ্পলীচূর্ণ যোগ করিয়া, শীতল হইলে সেব্য। ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে।

কণ্টকার্য্যাদি পাঁচন—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরেতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্‌তা, কট্‌কী, ইহার ক্বাথপানে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরাদি সত্বর নাশ হয়।

পুরাতন ও জীর্ণ জ্বর।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাঁচন—বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল, শুঠ। এই পাঁচন সেবনে পুরাতন জীর্ণ ও ধাতুগত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

এক ছটাক ক্ষেতপাপড়া, এক ছটাক গোলঞ্চ, এক ছটাক ধনিয়া, অর্দ্ধ ছটাক মুথা, অর্দ্ধ ছটাক হরীতকী, এক সঙ্গে এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইয়া প্রতি দিন অল্প উষ্ণ এক ছটাক করিয়া মধুর সঙ্গে পাঁচ দিন খাইলে পুরাতন জ্বর আরাম হয়।

চিরতা, মিছরি, মরিচ, যষ্টিমধু ও

ধনিয়া এক সঙ্গে একসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক আন্দাজ ২।৩ দিন খাওয়াইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর।

লক্ষণ—অল্প অল্প অন্তর্ভূত শীত, হাত পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্লেশ বোধ, গাঢ় নিদ্রা, দেহ ভারি, মস্তকে বেদনা, মুখ ও নাসিকা দ্বারা জলস্রাব, কাশ, ঘর্ম্ম না হওয়া, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের তাপ, ধমনীর মধ্যে বেগ, এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখা যায়, তাহাকেই বাতশ্লেষ্মা জ্বর বলে।

ঔষধ ব্যবস্থা—দশমূল, পাঁচন বা কথারতম নামক পাঁচন বাতশ্লেষ্মা জ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সংসার ও বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য কি? সংক্ষেপে বলিলে, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। সুতরাং একদিকে সংসার-রতি, অন্য দিকে বৈরাগ্য; এক দিকে ভোগ-বাসনার তরঙ্গোচ্ছ্বাস—অন্যদিকে হৃদয়ের নিস্পৃহ বিশ্রান্ত ভাব; এই দুইটী বিপরীত ভাবের যুগপৎ সম্মিলন স্থূল বুদ্ধিতে সম্ভবপর নহে। এই জন্যই বোধ হয় অনেক দিন হইতে বৈরাগ্য শব্দটীর সঙ্গে সংসার-ত্যাগের ভাবটী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বৈরাগ্য ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চতম সোপান। বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম, শব্দ ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধ। এই জন্যই বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, "সংসারে খাঁটি ধর্ম্ম হয় না; সংসার পরিত্যাগ কর—অরণ্যবাসী হও—খাঁটি ধর্ম্ম মিলিবে।" এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমাদের বৃদ্ধ ও যুবকগণ সংসার হইতে ধর্ম্মকে বিদায় দিয়াছেন। সংসার ও বৈরাগ্য—বিষয় কার্য্য ও ধর্ম্ম সাধন—দুইটী ভিন্ন রাজ্যের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা ভীষণ—কর্কশভাষী ও যথেচ্ছা-চারী; আবার গৃহে—সমাজে ও সভা-মণ্ডপে তাঁহারা কোমল মধুরভাষী ও মিতাচারী। কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মনিয়মকে পদদলিত করিয়া, গৃহে ফিরিয়া শান্ত-শিষ্টভাবে ধ্যানস্তিমিতলোচনে দুই চারি বার উপাসনা মন্ত্র পাঠ করিয়া মনে করেন, আজ আর একটী স্বর্গের সোপান প্রস্তুত হইল—আরও কিছু দূর উঠিয়া পড়িলাম।

ধীরচিত্তে একটুকু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বাস্তবিক সংসার ও বৈরাগ্যে কোন বিরোধ নাই। সংসারেই বৈরাগ্য—বৈরাগ্যেই সংসার। সংসার ভিন্ন বৈরাগ্য অর্থশূন্য—কাল্পনিক। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈরাগ্যের অর্থ সংসারে অনাসক্তি। সুতরাং যতক্ষণ বৈরাগ্য,

ততক্ষণ অনাসক্তির বিষয়ীভূত সংসারের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ সংসারেই বৈরাগ্যের আরম্ভ, সংসারেই ইহার পরিণতি। আবার বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার নরক—পিশাচের লীলাক্ষেত্র। বৈরাগ্যেই সংসারের উৎপত্তি—বৈরাগ্যেই ইহার স্থিতি, আবার বৈরাগ্যেই ইহার বিনাশ। ক্রমে ক্রমে এই ভাবগুলির পরিস্ফুটনের চেষ্টা করিব।

আমি বলিয়াছি, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। সংসারে থাকিলে পার্থিব দ্রব্যে আসক্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই আসক্তি ও অনাসক্তির যুগপৎ সম্মিলন কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা যাউক, এই আসক্তি ও অনাসক্তির প্রকৃত অর্থ কি?

মনুষ্যমাত্রেই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তিগুলির সাধারণ নাম স্বভাব-প্রবৃত্তি (Primary Instincts)। ইহাদের কতকগুলি আমাদের ভৌতিক শরীরের রক্ষা ও উন্নতি করিতেছে। আর কতকগুলি, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ও উন্নতির সহায়তা করিতেছে। প্রথম গুলি পশুদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। শেষোক্তগুলি কেবল অনন্ত উন্নতিশীল মনুষ্যেই দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থাতে এই প্রবৃত্তিগুলি অনাসক্ত ও নিস্পৃহ ভাব ব্যক্ত করে। ইহাদের একটা দ্বিতীয় অবস্থা আছে। এই অবস্থাতে ইহাদের নিস্পৃহভাব বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ভোগবাসনার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। এই সময়ে ইহারা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপযুক্তরূপে অনুশাসিত না হইলে, মনুষ্যজীবনের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয় এবং পশুত্ব তাহার স্থলে রাজত্ব করিতে থাকে। আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অভ্যুদয় হয়। এই অবস্থাতে এক প্রকারের "আসক্তির" উৎপত্তি হয়। তাহাকে আমরা "পৈশাচিক" কিম্বা "বৈষয়িক" আসক্তি বলিতে পারি। সংসারাসক্তির ইহাই প্রচলিত অর্থ। আসক্তির আর এক দিক্ আছে। তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে, ঐ দ্বিতীয়াবস্থার প্রবৃত্তিগুলি এক অতি আশ্চর্য্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া, সংসারের হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থাতেও এক প্রকারের "আসক্তি" আছে। ইহাকে আমরা "সাত্ত্বিক" বা "দৈবিক" আসক্তি বলিতে পারি। এই প্রকারের "আসক্তি" পরহিতার্থে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া—স্পৃহান্বিত। পার্থিব আত্মসুখ-পরাঙ্মুখ বলিয়া—নিঃস্পৃহ। এই প্রকারের আসক্তিই "অনাসক্তি।" অনাসক্তির অন্য অর্থ নাই। অনাসক্তি "ত্যাগ" নহে। অনাসক্তি আত্মপরাঙ্মুখী আসঙ্গলিপ্সা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, অনাসক্ত ভাব লইয়াই মানবপ্রকৃতির নির্ম্মাণ। এই অনাসক্ত ভাবের যথাযথক্রম বিকাশেই

মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক ও পূর্ণ বিকাশ। আমাদের বিষয়জ্ঞানের পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবের বিকৃতি না হইলেই আমাদের জীবনের মহত্ত্ব রক্ষিত হয়। কাজেই মানবজীবনের প্রথমে যেমন বৈরাগ্য—পরিণতাবস্থাতেও তেমনই বৈরাগ্য। তবে প্রথমোক্ত বৈরাগ্য আত্মজ্ঞান-বিশ্লিষ্ট; শেষোক্ত বৈরাগ্য আত্মজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট। এই প্রকারের বৈরাগ্যকেই আমরা প্রকৃত বৈরাগ্য বলিতে পারি।

আর একটী কথা। আমাদের অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের অতি নিকট সম্বন্ধ। বহির্জগতের জীবন্ত ক্রিয়া ভিন্ন অন্তর্জগতের পরিস্ফুটন হয় না। বিশেষতঃ মানবসমাজ পরিত্যাগ করিলে, আমাদের প্রবৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সন্তান-বাৎসল্য, দয়া, স্বজাতিপ্রিয়তা প্রভৃতি উক্ত প্রবৃত্তিগুলি মানবসমাজ ব্যতিরেকে পরিপুষ্ট হইতে পারে না। সন্তান না থাকিলে কাহার প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিব? দুঃখী না দেখিলে কাহার জন্ম দয়া হইবে? মনুষ্যসমাজে না থাকিলে কেমন করিয়া স্বজাতি-প্রিয়তা জন্মিবে? বস্তুতঃ এই প্রবৃত্তিগুলি আপেক্ষিক, বহির্জগতের কিছু না হইলে ইহাদের প্রয়োগ অথবা পরিচালনা হইতে পারে না।

আবার আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবৃত্তিগুলির কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সন্তানবাৎসল্য নিজগৃহ অতিক্রম করিয়া প্রতিবেশীর সন্তানকে আলিঙ্গন করে। দয়া স্বদেশ অতিক্রম করিয়া জগন্ময় বিস্তৃত হয়। স্বজাতিপ্রেম—বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত হয়। পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে বসিয়া স্নেহময়ী মাতা, অপরপ্রান্তস্থ বিজাতীয় সন্তানের দুঃখের কথা পাঠ করিয়া অশ্রুজল নিক্ষেপ করেন। দয়াবানের হৃদয় সুদূরদেশস্থ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া পার্থিব সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় ছুটিয়া যায়। বিশ্বপ্রেমিক পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হৃদয়ের প্রীতি বিতরণ করেন। আবার সর্ব্বোচ্চ প্রবৃত্তিগুলি, যথা বিস্ময়বুদ্ধি, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও ভক্তি সংসারাতীত রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এই জগতের হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বিস্ময়বুদ্ধি তখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিতে পরিণত হইয়া, কত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার করে;—সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, কত কাব্য, নাটক ও সঙ্গীত বিদ্যার সৃষ্টি করে—ভক্তি ধর্ম্ম নিয়মের সংস্থাপন করিয়া সামাজিক সুখ-শান্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পায়।

এখন স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, এই প্রবৃত্তিগুলির সমঞ্জসীভূত বিকাশেই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত। সংসার ভিন্ন এই সকলের সমঞ্জসীভূত বিকাশ হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই আবার বলি, সংসার ও বৈরাগ্যে কোনও বিরোধ নাই। উভয়ে ওতপ্রোত ভাবে সম্বদ্ধ। যে সুখেচ্ছা আমাদিগের পৈশাচিক বা বৈষয়িক

আসক্তিতে উপস্থিত করে, তাহা মানব প্রকৃতির বিকার বা অস্বাভাবিক বিকাশের ফলমাত্র।

এখন হয়ত কেহ আপত্তি করিবেন, যদি সংসারে থাকিলে মানব স্বভাব প্রবৃত্তিগুলির অস্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা রহিল, তবে সংসার-ত্যাগ কি শ্রেয়ঃ নহে? আমি উত্তর করিব, এইরূপ আপত্তিও অস্বাভাবিক। পরন্তু সকল ধর্ম্ম নিয়মেরই এই মূল বন্ধন (conditions)। যদি মানুষকে অদৃষ্টাধীন না বলিয়া স্বাধীন জীব বল, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যেখানে স্বাধীনতা সেখানে দুইটী বিপরীত অথবা বিরোধী পথের সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা স্বাধীনতার কোনও অর্থই নাই। যদি তুমি ইচ্ছা করিয়া দুইটী পথের যে কোনটীতে না যাইতে পার—কেবল একটীতেই যাইতে পার, তবে বুঝিব তুমি স্বাধীন নহ—পরাধীন। স্বাধীনতার অর্থ—দুইটী সমসাময়িক বিরোধী প্রবৃত্তির কোন একটীকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া। মানব-স্বভাব-প্রবৃত্তিগুলির অস্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়া যদি সংসার পরিত্যাগ করিতে চাও, তবে এই যুক্তিতে মানুষের অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম নিয়মকেও পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টবাদী হইতে পার। বস্তুতঃ এই বিরোধী প্রবৃত্তি গুলির সংগ্রাম-স্থলে, যদি ভালটীকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহার পথানুসরণ করা যায়, তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়; সে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সংগ্রামই মানুষের ধর্ম্ম—সংগ্রামেই তাহার মহত্ব প্রতিষ্ঠিত। "ধর্ম্ম-যুদ্ধে মৃতোবাপি-তেন লোকত্রয়ং জিতং" ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু হইলেও তিন লোক জিত হয়। বাস্তবিক যাহার জীবনে সংগ্রাম নাই, হয় সে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; নতুবা দেবত্ব লাভ করিয়া মুক্তির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই অবস্থাই সাধুদের মুক্তিধাম।

এ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। আমরা এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধকে দুই ভাবে দেখিতে পারি। এক স্থূল দৃষ্টিতে—আর এক সূক্ষ্ম বা দার্শনিক দৃষ্টিতে। যাঁহারা স্থূল দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁহারা এই উচ্চ সম্বন্ধকে নিম্ন করিয়া এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন—বেশী দূর আর যাইতে দেন না। স্ত্রীকে কেবলই এই পার্থিব জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বলিয়া মনে করেন—পিতা মাতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধকে এই জগতের মোহ-মায়ার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন—সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যে সংসারের স্বার্থ মিশ্রিত করেন—সুকীর্ত্তির প্রত্যাশাতেই বেশী পরিচালিত হইয়া দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন—বহির্জগতের উপকরণ গুলিকে কেবলই ভোগ-সুখের কারণ বলিয়া মনে করেন ইত্যাদি। যদি বা কখন কখন নিষ্কাম ভাব লক্ষিত হয়, তাহাও অতি নিম্ন শ্রেণীর। এই সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহা কোন সুদূর সংসারাতীত রাজ্যে পঁহুছিতে

পারে না। স্বভাব প্রবৃত্তিগুলির আংশিক বা পূর্ণ অস্বাভাবিক বিকাশেই ইহার অভ্যুদয়। আবার যাঁহারা দার্শনিক চক্ষুতে এই জগৎকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা এই সম্বন্ধকে অতি পবিত্র ও সংসারাতীত রাজ্যের সম্বন্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কেবল বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা সুদূর ভবিষ্যতেরও শিষ্য। ত্রিকালেই তাঁহাদের সাধনা। তাঁহারা এই ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া সংসারাতীত রাজ্যে উপস্থিত হন। এই বন্ধনরজ্জুর একপ্রান্ত দূর দূরান্তর ভেদ করিয়া সেই অনন্ত বিশ্বপিতার চরণ স্পর্শ করিয়াছে —অন্য প্রান্ত এই সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া মানবহৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী প্রভৃতি প্রত্যেকেই এই অনন্ত রজ্জুর এক একটী গ্রন্থিমাত্র। সকলেই এক দড়িতে বাঁধা। কেহ কাহাকেও পৃথক্ মনে করিতে পারেন না। এই অনন্ত বিশ্বপিতার চরণে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার জন্য ইহাঁদের প্রত্যেকেই তাঁহার দড়ি টানিতেছে। তিনি কাহাকেও নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য এই জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। সকলেই অনন্ত রাজ্যের পথিক। এই দার্শনিক দৃষ্টিই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বভাব-প্রবৃত্তিগুলির পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশেই ইহার অভ্যুদয়। আত্মজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার এই দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর ও উজ্জ্বলতর হইয়াছে, তাঁহারই প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। তিনি সংসারকে বৈরাগ্যের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। আবার বৈরাগ্যেই সংসারকে সংস্থাপিত বলিয়া মনে করেন।

সাধক কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ (Wordsworth) এই দার্শনিক ভাবে জগৎকে দেখিতেন। তাই মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

"To me the meanest flower that blows can give Thoughts, that do often lie too deep for tears".

ঐ নগণ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পটীও আমাকে এমন গভীর ভাব দিতে পারে, যাহাতে আমি অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

শ্রী অ।

নূতন সংবাদ।

১। জাতীয় মহাসমিতির চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ২৮শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হইবে। তজ্জন্য মান্দ্রাজ নগরে এক পটমণ্ডপ গঠিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিবেন।

২। অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ম্যান্সফিল্ড কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার

ফেয়ারব্যারণ কলিকাতা সহরে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি একজন উদারচেতা খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক।

৩। বড় লাট লর্ড এলগিন্ সস্ত্রীক ব্রহ্মদেশ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম-বাসীদিগকে সুমিষ্ট বক্তৃতা ও উপাধিদান দ্বারা আনন্দিত করিয়াছেন।

৪। কলিকাতার অনাথবন্ধু-সমিতি বিগত পূজার সময় নানা স্থানে দরিদ্র-দিগকে পরিধেয় বিতরণ করিয়াছেন, আবার শীতকালে গাত্রবস্ত্র বিতরণ করিতেছেন।

৫। সীমান্তে এক পাগলা মোল্লা দল বল সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। তাহার শাসনার্থ সৈন্যদল প্রেরিত হইতেছে।

৬। যুক্তরাজ্য স্পেনীয়দিগকে পরা-ভব করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের স্থায়ী সৈন্য ২৫০০০ ছিল, এক লক্ষ হইবে।

৭। ভারতহিতৈষিণী কুমারী ম্যানিঙ দ্বিতীয় বার ভারতদর্শনে আসিতেছেন। আগামী জানুয়ারিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। ভারতমহিলাগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উদ্‌যোগিনী হউন্।

৮। মান্দ্রাজের ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরে একটী ব্রাহ্মবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বর শ্রীমান্ গোবিন্দ রাজলু নাইডু বিলাত-ফেরত ডাক্তার, নিজামের সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করেন; কন্যা ডাক্তার অঘোরনাথের কন্যা সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

"হাসি ও অশ্রু" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং ইহার লেখিকাকে প্রতিভাশালিনী সুকবি বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি। ইতিমধ্যে যে কয়েকটী বঙ্গমহিলা কাব্যরচনায় যশস্বিনী হইয়াছেন তন্মধ্যে তিনি আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা। আমাদের আত্মীয়া কোনও বিচক্ষণা মহিলা এই পুস্তক সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সাদরে নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

হাসি ও অশ্রু—একখানি কবিতা-পুস্তক। রচয়িত্রী শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী—একজন বঙ্গমহিলা। অনেক দিনের নীরব বনে যখন পাপিয়া প্রথম তাহার মধুমাখা কণ্ঠ খুলিয়া দেয়, অচির ঘুমভাঙা মানবের প্রাণে সেই গীতি যেমন এক তীব্র লালসা, সুখময় আকুলতা এবং দিশাহারা উদাস ভাব জাগাইয়া দেয়, হাসি ও অশ্রুর অনেকগুলি কবিতা আমাদের-প্রাণেও সেই রকম ভাব সকল জাগাইয়া দিল। বঙ্গমহিলার লিখিত কবিতা-পুস্তক, এ দেশের কয় জনের পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে, জানি না। কিন্তু

যিনি পড়িবেন, তিনি কবিকে একটু ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতেছি। পরেরই জিনিস "নিজস্ব" বলিয়া পরিচয় না দিয়া, সরল, মধুর অথচ নিজের ভাবায় যিনি নিজ মনের কথা পরের হৃদয়ে মাখিয়া দিতে পারেন—সমীরণের মত অচ্ছের সলিলতুল্য হৃদয়ে সুস্পষ্ট স্পর্শ-রেখা রাখিয়া দিতে পারেন, তিনি প্রকৃত কবি। সে রেখা চিরস্থায়ী না হউক, হৃদয় আলোড়িত—আন্দোলিত করিয়া থাকে। সেই হিসাবেই শ্রীমতী সরোজ কুমারী একজন প্রকৃত কবি। এখনকার দিনে কবিতা লেখা অনেকেরই "অভ্যাস" হইতেছে—বলা বাহুল্য দুর্ভাগ্য বশতঃ তন্মধ্যে বহু জনের শ্রম "ব্যর্থ" হইয়া পড়িতেছে। এমন দিনে শ্রীমতী সরোজকুমারীর মত সুকবির অভ্যুদয়ে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। প্রকৃত গুণের আদর যদি না করি, তবে ভগবান্ মানুষকে গুণগ্রাহিতা শক্তি দিয়াছিলেন কিসের জন্য?

কবির সুমধুর কবিতাগুলি লইয়া বেশী আলোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না—যে নবস্ফুট ফুল চাঁদের আলো মাখিয়া ঢল ঢল করিতেছে, তাহাকে ছুঁইলে তাহার নীরব সৌন্দর্য্য সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে!—আমাদের সমালোচ্য কবিতাগুলিও সেই চন্দ্র-কিরণ-স্নাত ফুলের মত, তাই ভয় করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া বেশী কথা কহিলে পাছে তাহাদের মাধুর্য্য শুকাইয়া পড়ে! সে তো উপভোগ করিবারই জিনিস, কিন্তু সে অতি কোমল প্রাণে উপভোগ করিতে হইবে।

আমাদের কবির প্রতি আমাদের একটুকু অনুযোগ আছে।—"অনুযোগ" নহিলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও সম্পূর্ণ হয় না, এ কথা অনেকেই জানেন। আমাদের অনুযোগ এই যে, যাঁহার বাগানে এত সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে, তিনি আবার বিদেশীয় "পাতা বাহার" লইয়া টানা টানি কেন করিয়াছেন? * ইহাতে যদি তাঁহার উপবনের শোভা বাড়িত, তবে আমরা কথা কহিতাম না, কমিয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, যে সুকবি "জীবন প্রভাত, ভালবাসা, শোকোচ্ছ্বাস, শিশু হারা" প্রভৃতি কবিতায় পারিজাতের সৌরভ বিলাইয়াছেন, শেলী বার্ণস্ প্রভৃতি অনুবাদ করিতে তাঁহার বড় আবশ্যক ছিল কি?

যাহাহউক অনেক দিনের পরে আমরা এই পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কার শুনিলাম। শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, পুলকিত হইলাম, আর আশ্বাসিত হইলাম! ভগবান্ শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর লেখনীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

লেখিকা—বঙ্গবাসিনী।

* শেলী প্রভৃতি মহাকবি, তবে তাঁহাদিগের কবিতা "পাতা বাহার" বলিলাম অনুবাদের জন্য। কেহ আমার অপরাধ লইবেন না।—লেঃ।

বামারচনা।

আমি কেন অসুন্দর ?

কি যেন আমার ছিল গিয়াছে চলিয়া,
কি যেন রয়েছে শূন্য আমার পড়িয়া,
ক্ষুদ্র গৃহের ভিতরে,
প্রকৃতির অভ্যন্তরে,
দেখি যেন ছিল কিছু গিয়াছে উভিয়া ;
বুঝিতে না পারি আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া।
শিশুর আধল কথা—মিষ্টতা গিয়েছে,
গৃহ শ্মশানের তুল্য পড়িয়া রয়েছে,
আকাশে নবীন রবি,
শশাঙ্ক শীতল ছবি,—
কে যেন গোপনে শোভা হরণ করেছে,
দেখি সব সারহীন খোসাটি রয়েছে।
বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন,
মুছিয়ে ফেলেছি কবে নয়ন-অঞ্জন !
তাই আমি অসুন্দর,
তাই শূন্য চরাচর,
দেখিতেছি শোভাহীন ভূধর কানন,
নিরানন্দময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জীবন।
যেদিকে ফিরাই আঁখি দেখি অন্ধকার
জল স্থল নদনদী গিরিপারাবার।
কুসুমে সৌরভ নাই,
সংসার শ্মশান ছাই,
ছাইমাখা চরাচর অভাবে,কাহার ?
নাই সুখ নাই শান্তি শুধু হাহাকার।
সতী নারী পতি বিনে এ সংসারমাঝে,
হইলে সুন্দরী তার শোভা কিহে রাজে ?
পতিসুখে সতীসুখ,
লভি কত শত দুখ—
সতত প্রফুল্ল থাকে সংসারের কাজে,
তাহার নয়নে সব মধুময় সাজে,—
প্রাণপতি প্রাণেশ্বর অভাবেতে প্রাণ,
হারায়েছি দিব্য নেত্র—হয়েছি অজ্ঞান।
তাই সব শূন্যময়,
তাই শূন্য এ হৃদয়,
তাই প্রাণে উঠে না সে সুমধুর তান,
তাই শুষ্ক অসুন্দর আমার বয়ান।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

তুমি আমি।

এস এস সখি ! দুঃখিনীর ঘরে,—
পূজিব তোমায়, প্রেমপ্রীতিভরে।
গলাগলি হ'য়ে কব দু'ট কথা,
দেখাব মরমে কি অসহ্য ব্যথা।
হেথা—আপন গরবে মোহিত সবাই,—
ডাকিয়া সুধাই, হেন জন নাই
দলাদলি লয়ে সবাই বিভোর,—
তাই বলি সখি ! আয় কাছে মোর।
ফেলে এস তব স্বার্থের ভূষণ,—
তার তাপে মোর ঝলসে নয়ন।
পরে এস পূত নিঃস্বার্থ বসন,—
প্রেমভরে করি নিরেট বন্ধন—
নিকটে আসিয়া দাও দরশন,—
সে ছবি হেরিয়া জুড়াক জীবন—
হেন পূত ছবি পাই না দেখিতে,
তাই তোরে ডাকি আকুলিত চিতে।

দলাদলি এস দুটি পদে দলি।
কেনবা কিসের তরে দলাদলি?
যে জন তোমারে করেছে গঠন,—
আমারেও সখি! গড়েছে সে জন।

তুমি যার প্রজা এ মর ধরায়,—
আমিও তাহার বাঁধা রাঙা পায়,—
তুমি যারে ডাক আমি ডাকি তাঁয়।
এক পথে চলি প্রভেদ কথায়।

তুমি আমি কেন? সবে ডাকে তায়,—
নামের পার্থক্যে কিবা আসে যায়?
"জল" বলি সখি! কেহ জল খায়;
"ওয়াটার" কারো পিপাসা মিটায়।

তবু দলাদলি, নাহি ছি ছি লাজ।
দলাদলি সেত নীচতার কাজ।
এস তুমি আমি দূর ক'রে তায়,
বিশ্বসেবা-ব্রতে ঢালি আপনায়।

তাপিত পতিত যত জন আছে,
"ভাই বোন" বলে ডেকে লব কাছে।
এস তুমি আমি বিশ্ব-সেবাতরে—
শত প্রাণ বলি দিব হর্ষভরে।

বিশ্বপ্রেম দিয়া গড়িয়া নগর,—
তুমি আমি এস বাঁধি তাহে ঘর।
যাহার যা ইচ্ছা করুক তাহাই,
তুমি আমি এস প্রেমে ডুবে যাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

খোকার বিদায়।

খোকা গেছে কে জানে কোথায়?
আমি আছি পথ চেয়ে হায়!
তার সে খেলেনাগুলি ধুলিতে হতেছে ধুলি,
কে তাদেরে লইয়া খেলায়!
খোকা গেছে কোথা—কোন্ দেশে,
একবার চাবে না কি এসে!
সাধের কাপড় তার প'ড়ে আছে এক ধার,
সে কি তুলে লবে না'ক হেসে!
খোকা গেছে কোথা—কত দূরে,
শূন্য শেয় পালঙ্ক উপরে,
এক পাশ শূন্য রাখি—সেথা হতে আসি সে কি
ঘুমোবে না রজনী মাঝারে!
খোকা গেছে সে দেশ কোথায়!
কার কোলে রয়েছে সেথায়!

তাহার দুধের বাটি, সাধের ঝিনুক সেটি
ক্ষুধা পেলে কেবা তা যোগায়!
খোকা আজি গেল কোন্ দেশে,
খেলাতেছে কোন্ নব বেশে!
কোন্ স্বরগের পুরে, একা বেড়াতেছে ঘুরে,
আধ আধ কথা ক'য়ে হেসে।
খেলা-শ্রান্ত হইবে যখন,
ঘুমে ঢুলে আসিবে নয়ন,
তখন আকুল হয়ে থাকে বুঝি শুধু চেয়ে,
মনে পড়ে মায়ের আনন।
শত পুষ্প ঘেরা পথ ছায়,
নাহিক কণ্টকরাশি তায়।
মার স্নেহভরা বুকে, ঘুমাত যেমন সুখে,
তেমনি কি মিলিবে সেথায়!

আয় তবে আয় খোকা আয়,
কোথা মোর 'অরুণ' কোথায়!
আঁধার পরাণ মোর, কই সে উষার ঘোর,
অন্ধ আঁখি সে 'মণি' হারায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

দুর্গোৎসব।

চৌপাশে দোকান পাট, নব অভিনব ঠাট,
আমোদ প্রমোদ রঙ্গ কত বাজি খেলা;
সুচিকণ, মনোহর, রঙ্গিন বসন থর,
শিশু-মন-মোহকর খেলনার মেলা!
প্রতি মুখে হাসিরাশি ঢালিছে সানাই, বাঁশী,
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য দিবস যামিনী;
হয়ে উলসিত মন, মহাপূজা আয়োজন,
করিতেছে শুচিব্রতা কুলের কামিনী।
দুঃখ সে ঢেকেছে মুখ, লহরে ছুটেছে সুখ,
মরি, কি কল্যাণস্রোতে স্নাত বঙ্গভূমি!
শীতল অনিলরাশি সরল সোহাগে ভাসি
লুটিতেছে দেবালয়ে পরিমল চুমি।
সুরভি কুসুমরাজি স্বরগ শিশিরে সাজি,
করিছে পবিত্রতর সুকোমল কায়,
ক্ষুদ্র বিল্বদলগুলি নাচিছে পুলকে ভুলি
দুরলভ অর্ঘ্য হতে দেবতার পায়!
শরতের নীলাকাশে গাহিতেছে প্রেমোচ্ছ্বাসে,
এ মহা হরষ-গীতি; বিহঙ্গমগণ
আপনি মা বসুন্ধরা লয়ে আনন্দের ভরা
যেন রে জীবের তাপ করিছে হরণ।
নারী চির-কাঙালিনী, অনাথিনী, অভাগিনী,
আজন্ম অভাগা নর, শিশুর (ও) পরাণে
এ শিব তরঙ্গমালা দ্বাদশ মাসের জ্বালা
প্রক্ষালি করিছে তৃপ্ত শান্তি সুধা দানে।
তিনটি দিনের পরে এ সুখও পড়িবে ঝরে
কোথায় লুকায়ে রবে স্বপনের প্রায়!
সংসারের নশ্বরতা, সুখ দুঃখ বিলীনতা,
জীবন মরণ কিবা তাও হেন হায়!
রে সুখ পীযুষ সবি! জলাশয় গর্ভে রবি,
লুটাবে বিজয়া গীতি, শোক-স্মৃতি আর,
শত দীপ দীপ্তালয়ে, জনস্রোত বিনিময়ে,
খেলিবে দু'দিন পরে বিজন আঁধার!
কিসের এ সুখোৎসব? কেনরে প্রফুল্ল সব?
শুধু আনন্দের রব, মহোল্লাস গীতি?
সন্তাপিত বঙ্গালয় এ সুখের অভিনয়
কেনরে করিছে আজি, কিসের এ প্রীতি?
বসন ভূষণে সাজি বিশ্বজননী কি আজি,
অবতীর্ণা বঙ্গগেহে, তাই এ কুশল?
বহুল বিবিধ রাগে, সাজহিয়া অনুরাগে,
অজ্ঞান আঁধারে অন্ধ মানব সকল;—
পুতুলে প্রতিষ্ঠা করি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী
পূজিছে পরমানন্দে চরণযুগল।
হয়ে প্রেমে দিশাহারা পূত ভক্তি প্রীতিধারা
ঢালিছে সে পদযুগে তাই অবিরল!
নিখিল এ বঙ্গ হায়! অনাদি অনন্ত পায়,
যদি এ উচ্ছ্বাসরাশি করিত অর্পণ—
পূজিত হৃদয় ভরি অদ্বিতীয়া একেশ্বরী

হ'ত কি বিমল দৃশ্য স্বরগ-শোভন !
তা হোক্ এ ভক্তিরাশি, হে ভকত
বঙ্গবাসী !
অবশ্য স্পর্শিবে সেই রাজীব-চরণ ;
তাঁহারি কৃপায় কালে নাশি ভুল ভ্রান্তি
জালে
করিবে সত্যের রবি জ্যোতি বিকিরণ।
অনর্থক অর্থব্যয় করিও না অপচয়,
মায়েরে তোষহ তুমি দীন হীনগণে ;
তাদের মলিন মুখে ফুটান-উজল-সুখে—
সেই সে অমর কীর্ত্তি মাতৃ-নিকেতনে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

বাঞ্ছা।

বাসনা হয়েছে মনে
মিশিব সাগর সনে
কত দেশে যাব।
প্রভাতের উষালোকে
মধ্যাহ্ন নিদাঘ বায়
প্রেম গান গাব।
গোধূলির নীলাকাশে
রজনীর স্নিগ্ধতায়
আকুল হৃদয় রাখি,
কুসুমের পরিমলে
শুভ্র শিশিরের তলে
মিশে মিশে থাকি।
তটিনীর কলতানে
গাহিব আকুল প্রাণে
তরল তরঙ্গ ভরে
ভেসে ভেসে যাব।
শিশুর মধুর হাসে,
প্রণয়ীর প্রেম-ভাষে
মায়ের বিমল স্নেহে ;
শোকের নয়নজলে,
আঁধার হৃদয়তলে,
অতীত সুখের গেহে।
জোছনায় ফুলবনে
উদাস নয়নকোণে
সদা মিশে রব ;
আকাশের তারা সাথে
মিশিব আঁধার রাতে
স্নিগ্ধ জ্যোতি ঢালি;
অনুদিন রব মিশে
সুধাধার নীলাকাশে
সুস্থির বিজলী।
ধবল জোছনা-করে
বাসন্তি লতার পরে
ফুল ফুটে রব।
বাঞ্ছা মোর এ হৃদয়
হবে পবিত্রতাময়,
চির দিন সকলের
প্রতিচ্ছায়া হব।

শ্রীসরলা দত্ত।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৮-৯৯ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "লজ্জাশীলতাই নারীর প্রধান ভূষণ এবং পতি-সেবাই নারীর প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক্ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোনপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৮ অব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ডালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্ বুক্ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে প্রবন্ধটী পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটীকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা
২১ অক্টোবর, ১৮৯৮

সি, এ, মার্টিন
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

No. 407 December, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৬ বর্ষ। ৪০৭ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৫—ডিসেম্বর ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—মহামান্য লর্ড কুর্জন ডিসেম্বর মাসে বিলাত হইতে শুভ-যাত্রা করিয়া ৩০শে তারিখে বোম্বাই নগরে পদার্পণ করেন। ইংরাজি নববর্ষের প্রথমে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ৩রা কলিকাতায় শুভাগমন ও ৭ই জানুয়ারী গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার প্রথম লেবি দরবার হইবে। আমরা সাদরে নব রাজ-প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

নূতন প্রধান সেনাপতি—সার উইলিয়ম লক্‌হার্ট—যিনি সীমান্ত যুদ্ধে রণ-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,—তিনি সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

নূতন ডিরেক্‌টর—ডাক্তার সি, এ, মার্টিন্ অবসর গ্রহণ করাতে বৈজ্ঞানিক এ পেডলার তাঁহার স্থানে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছেন।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—গত বড় দিন হইতে এক আনা মাশুলে বিলাতী চিঠি চলিতেছে।

নূতন কয়লার খনি—আসামে একটী নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভারতের বাণিজ্যের যুগান্তর হইবে অনেকে মনে করিতেছেন।

নূতন সমাচার—অনেকগুলি খ্রীষ্টান পণ্ডিত একত্র মিলিয়া মূল গ্রীক ভাষা হইতে বাইবেলের নূতন অনুবাদ করিতেছেন। ইহা "The twentieth Century New Testament"—বিংশ শতাব্দীর নূতন সুসমাচার—নামে প্রচারিত হইবে।

অন্তঃপুরিকাদিগের সমাদর—বোম্বাই

শাসনকর্ত্তার সহধর্ম্মিণী লেডি স্যাণ্ডহর্ষ্ট তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট-হাউসে দেশীয় মহিলা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন। ২০০ শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু—গত ৫ই ডিসেম্বর আগ্রা নগরে রায় শালীগ্রাম বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এক সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারাল্ ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ইনি ধর্ম্মসাধনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সমুদায় আয় সাধুসেবাতেই ব্যয়িত হইত।

পারিতোষিক রচনা—১৮৯৭-১৮৯৮ সালের পরীক্ষায় শ্রীমতী স্বরলতিকা ঘোষের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে তিনি ব্রজমোহন দত্তের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজ-আতিথি—নিম্নলিখিত রাজগণ পুরাতন বড় লাটকে বিদায় দিবার ও নূতন বড়লাটকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন:—

কাশ্মীরের মহারাজা, কাশীর মহারাজা, হাইদ্রাবাদের নিজাম, ত্রিপুরার মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, রামপুরের মহারাজা, অযোধ্যার মহারাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

ক্রীড়া-কৌতুক—বেলুনবাজ ভ্যাণ্টা-সেল্ কলিকাতায় আসিয়া বেলুন চড়ার বাহাদুরী দেখাইতেছেন। প্রিন্স রণজিৎ সিং কলিকাতার গড়ের মাঠে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ক্রিকেট-ক্রীড়া-যুদ্ধ করিতেছেন। খৃষ্টের জন্মোৎসবদিনে গড়ের মাঠে বার্ষিক ঘোড়দৌড় প্রভৃতির অভাব হয় নাই।

চন্দ্রগ্রহণ—গত ২৭শে ডিসেম্বর চন্দ্র-গ্রহণ হইয়াছিল। চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল।

দান—(১) কাশীতে এক দরিদ্রা-বাস স্থাপনার্থ ভিজায় রাজা গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী ইহাতে বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে।

(২) দ্বারবঙ্গের নূতন রাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর পরলোকগত জ্যেষ্ঠের স্বর্গকামনায় ভারতের সকল প্রদেশের দরিদ্রদিগের ভোজের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১০০০০, এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০০০ করিয়া টাকা দিয়াছেন।

(৩) ত্রিপুরার মহারাজ ত্রিপুরা-হিতসাধনী সভার সাহায্যার্থ বার্ষিক ১০০ টাকা ও এককালীন ৫০৲ টাকা দিয়াছেন।

কুমারী ম্যানিঙ্—নারী-হিতৈষিণী এই ইংরাজ রমণী ভারতে দ্বিতীয়বার আসিয়াছেন। দেশীয় মহিলা ও বামাহিতৈষিগণ ইহাঁর সমুচিত অভ্যর্থনা ও ইহাঁর শুভ-সঙ্কল্প সিদ্ধির সহায়তা করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

আত্মসংযম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪। মমতা—ভালবাসাই মমতার মূল। ভালবাসা যে আমাদের সর্ব্বোচ্চ রমণীয় প্রবৃত্তি, এ কথা নূতন করিয়া বলা বাহুলামাত্র। এই ভালবাসা ঘনীভূত হইলে তাহাকে "মমতা" বলিয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে "আমারই" বলিয়া যে জ্ঞান, ইহাই মমতার কার্য্য। মহা-প্রাণ ব্যক্তিদিগের মমতা, তাঁহাদের মুক্তি-স্বরূপ। যিনি আত্ম-পরিজন হইতে মমতা অনুশীলন করিয়া স্বদেশ, সমাজ, বিশ্বজগৎ—তার পরে ভগবানে সেই মমতা বিকশিত ও চরিতার্থ করিতে পারেন, তিনি মুক্ত জীব—তিনি নরদেহে দেবতা। মহাত্মা রামচন্দ্র সমাজের মমতায় প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ক্ষত্রিয়গণ স্বদেশের মমতায় নিজের সর্ব্বস্ব অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; শাক্যসিংহ বিশ্বজগতের মমতায় সকল ভোগসুখে পদাঘাত করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্য দেব ভগবৎ-মমতায় নরদেহে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সবলের পক্ষে মমতা মুক্তি স্বরূপ, এ কথা সেই জন্যই বলিতেছিলাম। কিন্তু সবলের পক্ষে মমতা "মুক্তি স্বরূপ" হইলেও দুর্ব্বলের পক্ষে—সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা বড়ই ভয়ানক হইয়া থাকে। মমতা, স্বার্থপরতার যোগে "মোহ" নামক দারুণ রিপু হইয়া নর-মানবের নরকের পথ প্রশস্ত করে।

মোহ রিপু মানবকে যার পর নাই সঙ্কীর্ণ-চেতা ও নীচ করিয়া ফেলে। রামায়ণে আছে মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী, ভরতকে রাজ্য দিতে এবং রামকে নির্ব্বাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্থরার কু-মন্ত্রণার মর্ম্ম এই যে "রাম তোমার সপত্নী-পুত্র; শাস্ত্রানুসারে রাজত্ব তাহার প্রাপ্য হইলেও সে বনে যাউক, কেননা তাহাতে তোমার পুত্র ভরত নিরুদ্বেগ হইবে। ভরত তোমার গর্ভজাত পুত্র, সে রাজা হউক, কেননা তাহাতে তুমি অধিকতর আনন্দ লাভ করিবে।" আত্মসুখের প্রতি এইরূপ যে আসক্তি, তাহাই মোহ। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ নহে * *। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ্ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয় চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সেই জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন এমন বিষয় নাই।

যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট।" সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ঐরূপ ব্যক্তিদিগের মধ্যে লোভ ও অহঙ্কারের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মূলতঃ উহাই মোহের কার্য্য। ঐ যে "আমার আমার" উহাই মোহ। মোহ মানবের কাণ্ড-জ্ঞান এতই বিনষ্ট করে! বলিতে লজ্জা করে বঙ্গগৃহে অনেক মহিলা স্বামী বা পুত্রের অদর্শনে যে অন্ন জল ত্যাগ করেন, তাহাও মোহের একবিধ শাখা। যে জননী আপন পুত্রের জন্য সুখাদ্য এবং বিধবা মাতার পুত্রের জন্য কুখাদ্য ভাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার মাতৃস্নেহ মোহের আবরণে আবৃত। কৃপণের অর্থাদির প্রতি যে অনুচিত আসক্তি, তাহাও মোহের কার্য্য।

মোহ রিপু নিবারণের উপায় উদারতা অভ্যাস করা। প্রীতি বৃত্তি যতই সম্প্রসারিত হইবে, ততই উদারতা অভ্যস্ত হইবে। আপনার ছেলেটীকে তো ভালবাসি, পিতৃহীন ভ্রাতুস্পুত্রটীকেও ভাল-বাসিব; দূর-সম্পর্কীয় অনাথ শিশুটীকেও ভালবাসিব; নিঃসম্পর্কীয় অন্ধ ভিক্ষুককেও ভালবাসিতে হইবে। এইরূপ কর্ত্তব্য-বোধে প্রীতিবৃত্তির বিকাশ করিতে করিতে ভালবাসা আপনা হইতেই বাড়িবে —মোহের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে। একটা কথা এই যে, যাহারা আমাদের পোষ্য, তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা আমাদের তো অবশ্য কর্ত্তব্য, অসঙ্গতি নিবন্ধন অন্যের সেরূপ করিতে না পারিলেও আমরা প্রীতির অনুশীলন করিলে মোহাসক্ত হইব না। যে ব্যক্তি প্রীতির অনুশীলন করিতে চেষ্টা করে, সে কৃপণতার জন্য যে "ছল ছুতা" করিবে না, এ কথা বলা তো বাহুল্য। অতএব অর্থের অসঙ্গতি জন্য পরের আর্থিক সাহায্য করিতে না পারিলেও পরকে ভালবাসিতে কেহ বিমুখ হইও না। হৃদয় প্রশস্ত হইলে মোহ-রিপুর হাত এড়াইতে পারিবে, সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

এই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধিকারিণী ভগবতী বিশ্বজননী। তিনি আমারই, আমি তাঁহারই। তাঁহার যাহা কিছু, তৎসমুদায়কে ভালবাসিবই। এইরূপ সংস্কারে কর্ত্তব্যবোধে ভালবাসা আরম্ভ করিলে, মানবের ভালবাসার যথোচিত বিকাশ হইবেই হইবে। ভালবাসার নেশা বড়ই নেশা, মানবকে তাহার বাধ্য হইতেই হইবে।

আর এক কথা, অনেক রিপুর বাহ্যিক একটা আবরণ থাকে, তাই সময়ে সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তিও পাপকে চিনিতে না পারিয়া পুণ্যভ্রমে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। মোহ রিপুরও এমনি একটা সুন্দর আবরণ আছে; সহসা দেখিলে মোহকে নীচ প্রবৃত্তি বলিয়া চিনিতে না পারিয়া সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি প্রেম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আঁধার ও আলোকে যেরূপ প্রভেদ, মানবে ও

মানবে যেরূপ প্রভেদ, নরক ও স্বর্গে যেরূপ প্রভেদ, মোহ রিপু হইতে প্রেম প্রবৃত্তিরও সেইরূপ প্রভেদ। কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা মোহ ও প্রেমের প্রভেদ বলা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুত্রাদি কোনও আত্মীয় বিদ্যা বা অর্থোপার্জ্জনার্থে দূর দেশে যাইতেছে, তাহার অদর্শন-জনিত কষ্টে তাহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা মোহের কার্য্য। পক্ষান্তরে যিনি পীড়িত পুত্রের সুচিকিৎসা জন্ম সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য প্রেমের কার্য্য। মোহ সঙ্কীর্ণ, দুর্ব্বল,মোহ স্বার্থপর। প্রেম উদার, সবল, প্রেম পরার্থপর। যে ব্যক্তি তাহার প্রীতিভাজনকে বলে "আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হই, অতএব, তুমি সকল অনুষ্ঠেয় কার্য্য ছাড়িয়া আমার কাছে বসিয়া থাক—তাহাতে তোমার অধর্ম্ম হয়, অজ্ঞানতা হয়, দরিদ্রতা হয়, অযশ হয়, যাহাই হয় হউক, আমি তোমাকে চক্ষের উপরেই রাখিব, কেননা তাহাতেই আমার সুখ"; সে ব্যক্তি মোহপরায়ণ, প্রেমের কথা সে জানে না। আর যিনি তাঁহার প্রীতিভাজনকে বলেন "তোমাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হই, কিন্তু তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে দেখিলে আরও বেশী সুখী হই —কেননা তাহাতেই তুমি অধিকতর সুখী হইবে। তোমার মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াই আমার পরম সুখ। তুমি জ্ঞানার্জ্জনার্থে ইয়োরোপে যাইতেছ, তোমার অদর্শনে আমার মন কাতর হইবে বটে, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশয়েই সে কাতরতায় আমি অবসন্ন হইব না, বরং পরম পরিতৃপ্ত হইব," তিনিই প্রেমপরায়ণ। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া মোহ হইতে প্রেমের পার্থক্য চিনিতে পারা যায়; তাহা চিনিতে পারিলে কেহ বিষকে আর অমৃত মনে করিবেন না।

(ক্রমশঃ)।

পক্ষীদিগের সম্বন্ধে পৌরাণিক মত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পক্ষীদিগের সম্বন্ধে নানা দেশে নানা জাতি মধ্যে বিবিধ সংস্কার দেখা যায়। পক্ষীদিগের গতি, স্বর, উপবেশন প্রভৃতি কার্য্য বিবিধ শুভাশুভ ঘটনার পরিচায়ক। কাক-চরিত্র বিদ্যা যাহা দ্বারা এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা কেবল হিন্দু-দিগের মধ্যে বদ্ধ নহে, প্রাচীন রোমক দৈবজ্ঞগণ ইহার বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। রোমের সংস্থাপক রমুলস ও তাঁহার যমজ সহোদর রিমসের মধ্যে রাজত্ব লইয়া বিবাদ হয়, রমুলস রিমস অপেক্ষা দ্বিগুণসংখ্যক শকুনি দর্শন করাতে জয় লাভ করেন।

প্রাচীন দেবোপাসকদিগের মতে বিশেষ বিশেষ পক্ষী বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রিয়। হিন্দু পুরাণে ব্রহ্মার হংস, বিষ্ণুর গরুড়, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পেচক, কার্ত্তিকের ময়ূর যেমন প্রিয়, গ্রীক পুরাণে যোভের ঈগল, জুনোদেবীর ময়ূর ও হংস, মিনার্ভার পেচক, মার্সদেবের কাঠঠোকরা এবং রতি দেবীর চটক ও ঘুঘু পক্ষী সেইরূপ প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। দেবতারা কখন কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক বিহঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং নরনারীগণ শাপ-গ্রস্ত হইয়া বিহঙ্গযোনি প্রাপ্ত হয়। বেদে অগ্নি বাজপক্ষী হইয়াছিলেন। জুপিটার গানিমিদি নাম্নী রূপবতী রমণীর মন হরণ করিবার জন্য ঈগলমূর্ত্তি এবং লীডানাম্নী অন্য নারীর প্রিয়পাত্র হইবার জন্য সোয়ান পক্ষীর রূপ ধারণ করেন। নলরাজ দেবতাদিগের বরে রাজ-হংস হইয়া দময়ন্তীর চিত্ত হরণ করেন। প্রসিদ্ধ ব্রিটিষরাজ আর্থর দাঁড়কাক হইয়াছিলেন এইরূপ জনপ্রবাদ।

অসভ্য জাতিগণের মধ্যে অদ্যাপি পক্ষীদিগের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিশ্বাস আছে। আমেরিকার এক শ্রেণীর আদিমনিবাসীরা বিশ্বাস করে, কাক পক্ষী তাহাদিগের আদি পুরুষ। কালি-ফর্ণিয়ার টুপারাগুয়া জাতি পেচককে বীরপ্রধান বলিয়া মনে করে। পিমাস জাতির মধ্যে পৃথিবীর মহাজলপ্লাবনের কর্ত্তা ঈগল পক্ষী।

আত্মা দেহত্যাগানন্তর পক্ষিরূপে লোকান্তরে যায়, ইহা একটী প্রাচীন বিশ্বাস। অনেক লোকে ইহাও বিশ্বাস করে যে, আত্মা সকল পক্ষিরূপে আমাদের চারি দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। পাউহাটান নামক এক জাতি বন্য পক্ষী-দিগকে আপনাদের মৃত বীরদিগের রূপান্তরিত আত্মা মনে করিয়া তাহাদিগকে শিকার করে না। হুরণ জাতি পান-কৌটীকে দেহমুক্ত আত্মার রূপান্তর বলিয়া পবিত্র জ্ঞান করে।

দেশবিশেষে কতকগুলি পক্ষী পবিত্র ও মঙ্গলসূচক বলিয়া পূজিত, আবার অপর কতকগুলি অপবিত্র ও অমঙ্গলের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিয়া ঘৃণিত। আমাদের দেশে লক্ষ্মীপেঁচা, শঙ্খচিল, কপোত প্রভৃতি সুলক্ষণসূচক। কালপেঁচা, শকুনি, ভোতল, কড় কড়ে, প্রভৃতি পক্ষী অমঙ্গল-কর ও যমের অনুচর। এ সকল পক্ষী যেখানে গমনাগমন করে, তথাকার ভদ্রস্থতা নাই। ইহাদের শব্দ যত দূর শ্রুত হয়, তত দূর মহামারী প্রভৃতি দুর্ঘটনা বিস্তারিত হয়।

সমগ্র ইউরোপে সারসপক্ষী পবিত্র বলিয়া সমাদৃত। চাতকও তদনুরূপ। সুইডিসদিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, যিশুখৃষ্ট যখন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া হত হন, তখন সারস (ষ্টার্ক) ষ্টার্কা ষ্টার্কা বলিয়া তাঁহার বল বিধান করে এবং চাতক (সোয়ালো) সোলা সোলা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে। ইহারা বাটীতে থাকিলে মঙ্গল

এবং ইহাদিগের বাসা ভাঙ্গিলে অমঙ্গল হয়।

রবিন প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার পক্ষী পবিত্র বলিয়া আদৃত। স্কটলণ্ড-বাসীরা বলে রবিনকে বিরক্ত করিতে নাই। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের এক ফোঁটা রক্ত আছে।

ব্রিটনদিগের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী আছে। (wren) রেণ পক্ষী স্বর্গ হইতে অগ্নি আনয়ন করে, ইহাতে তাহার কতকগুলি পালক পুড়িয়া যায়। রেণ অতি ক্ষুদ্রকায় এবং ঈগল বৃহদাকার পক্ষী। ইহাদিগের মধ্যে কে রাজা হইবে এই কথা লইয়া বিবাদ হইল। পরে স্থির হইল যে, যে অধিক উচ্চে উঠিতে পারিবে, সেই রাজা হইবে। ঈগল দ্রুতগামী, রেণকে অনায়াসে পরাজয় করিবে মনে করিল। কিন্তু রেণ ঈগলের পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা উচ্চে উঠিল এবং জয় লাভ করিল।

ঘুঘু পক্ষী আমাদের দেশে অমঙ্গলকর। ঘুঘু যাহার ভিটায় চরে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু খৃষ্টানেরা ইহাকে অমরত্ব, দাম্পত্য প্রেম ও নম্রতার আদর্শ বলেন।

ঈগল পক্ষীর বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা প্রচলিত। প্রাচীন জনশ্রুতি, পক্ষিরাজ ঈগল প্রতি ১০ বৎসরে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী অগ্নিময় প্রদেশে গমন করেন এবং সমুদ্রে ঝম্প দিয়া নব যৌবন লাভ করেন।

ফিনিক্স নামক এক পক্ষীর সম্বন্ধে জনশ্রুতি—ইহা এক যুগে একটী মাত্র জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধ হইয়া অগ্নিতে আপনাকে দগ্ধ করে এবং তাহার শরীরের ভস্মরাশি হইতে আর এক নূতন ফিনিক্স উৎপন্ন হয়।

সোয়ান পক্ষী সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতে একটি কিম্বদন্তী আছে যে, ইহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এ অতি সুস্বরে গান করে।

আমাদের দেশের ডাক পাখীর সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস, তাহারা ডিম পাড়িয়া অবিশ্রান্ত চিৎকার করিতে থাকে। চিৎকার করিতে করিতে গলা চিরিয়া এক বিন্দু রক্তপাত হয়, তাহা দ্বারা তাহাদের ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয়।

পেলিকান নামক সমুদ্রপক্ষীর বিষয়ে এইরূপ জনশ্রুতি পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত আছে। সে তাহার বক্ষ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া সন্তানকে পান করায়। আরও কথিত আছে যে, পেলিকানেরা মৃত অবস্থায় জন্মে, পক্ষিমাতা বক্ষঃস্থলের এক ফোঁটা রক্ত দিয়া তাহাদিকে বাঁচাইয়া তুলেন।

মাছরাঙা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সংস্কার, ইহা যখন ডিম ফুটায়, তখন ভাল হাওয়া বয়। প্লিনী, বার্জিল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

দেবলরাজ।

(গত-প্রকাশিতের পর)

(৫)

চৌবেড়িয়ায় দেবনাথ পালের মাতুলালয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এজন্ম দেবনাথ চৌবেড়িয়ায় বড় একটা যাইতেন না। কারণ সেখানে পঞ্চ পাণ্ডব সদৃশ পঞ্চ মাতুল বিদ্যমান ছিলেন ;—কেহ নিজ বিষয় কার্য্য দেখিতেন, কেহবা সম্ভ্রমজনক অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, —কেহবা তৎকালীন রাজস্ব-নবাব ক্রোরীয়ান গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রাজধানী পূর্ব্বস্থলীতে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ;—কেহবা রাজপুত্রের ন্যায় বাড়ীতে বসিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গে নিয়ত আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইতেন। সেই স্থানে মাটী কাটিতে যাইতে দেবনাথের মাথা কাটা যাইত। এজন্ম বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তিনি চৌবেড়িয়ায় যাইতেন না। যে দেবনাথের মাতামহ ও মাতুলগণের অবস্থা এতাদৃশ অনুকূল, সেই দেবনাথকে মাটির ঝুড়ী মাথায় বহিতে হয়, এ ঘটনা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে ; কিন্তু দেবনাথ অলস ভাবে পরের গলগ্রহ হইয়া অন্নাচ্ছাদনের সুখভোগ করা অপেক্ষা, আপনার শ্রম ও ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া দুঃখ ভোগ করাও সুখ মনে করিতেন। এই জন্ম তিনি বর্ত্তমান কালের ন্যায় "শালাবাবু" বা "ভাগিনেবাবু" হইতে পারেন নাই।

হাট, বাজার ও মেলা এই তিনটা শব্দ বহুদিন হইতে বঙ্গ দেশে প্রচলিত আছে, যে স্থানে দিবসের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কালে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি ও বিক্রয় হইয়া যায়, তাহাকে হাট কহে। যে স্থানে দীর্ঘকালস্থায়ী দোকান পাট আছে, তাহাকে বাজার বলে। আর যে স্থানে মাসের মধ্যে বা বৎসরের মধ্যে ২।৪ দিন ব্যাপিয়া বিবিধ দ্রব্যের আমদানী ও বহু লোকের সমাগম হয়, তাহাকে মেলা বলে। এই মেলা আবার শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রকার। আমরা যে সময়ের গল্প ফাঁদিয়াছি, সে সময়েও এই প্রকার নানা স্থানে হাট, বাজার ও মেলা হইত। হাটের অনেক নাম আছে। নিত্য হাট, একের হাট, দুইয়ের হাট, পাঁচের হাট, সাতের হাট ইত্যাদি। আবার বার ধরিয়াও হাট বসিয়া থাকে। শ্রীনগরে নিত্য হাট ও মঙ্গল শুক্রের হাট হইত। চৌবেড়িয়ায় তিনের হাট ও প্রতি মাসে বুড়ো শিবের এক দিন মেলা হইত। হাঙ্গরীবাকে পাঁচের হাট বসিত। এই হাটের খুব সমৃদ্ধি ছিল। অনেক জিনিস পত্র আসিত ও দশ পনরখানা

গ্রামের লোক জুটিত। এই দিন দেবনাথ অন্য কোন স্থানের হাটে যাইতেন না,—ঘরে বসিয়া হাঁড়ী কুঁড়ি বিক্রয় করিতেন। শ্রীনগরের অনেকাংশ বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও অনেক লোকের বাস ছিল। এজন্য প্রথমে একটী সামান্য প্রকারের বাজার ছিল এবং মাছ তরকারীর হাট বসিত। তদ্ভিন্ন প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে খুব জাঁকের হাট হইত। দেবনাথ এই দুইটী হাটে যাইতেন। চৌবেড়িয়ার তিনের হাটে অর্থাৎ তিন দিন অন্তর যে হাট হইত, সে হাটে অতিশয় হাঁড়ি কলসীর বেচা কেনা হইলেও দেবনাথ কদাচ সে হাটে যাইতেন না। কিন্তু বুড়ো শিবের মাসিক মেলায় না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেননা সপ্তাহের মধ্যে শ্রীনগরের দুইটী এবং নিজ গ্রামের একটী এই তিনটী হাটে যত বেচা কেনা হইত, এক বুড়ো শিবের মেলায় তত বিক্রয় করিতেন।

এখন যেমন নন্দনঘাট, বায়হাট, কায়েতপাড়া, চন্দননগর প্রভৃতির হাঁড়ি প্রসিদ্ধ, তখন হাঙ্গরীবাঁক, শ্রীনগর ও চৌবেড়িয়ার হাঁড়ী তদ্রূপ প্রসিদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে দেবনাথ পালের হাতের হাঁড়ী লোকে সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ করিত। চৌবেড়িয়ার চতুর্দ্দিকেই অরণ্য ছিল। ঈশান কোণের বন অধিকতর নিবিড়। এই বনে এক প্রকাণ্ড শিব-মন্দির ছিল। তন্মধ্যে এক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির কত কালের এবং কাহার প্রতিষ্ঠা করা, তাহা জানা যায় না। ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা করা বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ঐ শিবের সেবার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য্য। মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ ঘন বনে আবৃত হইলেও সম্মুখে অতিশয় প্রশস্ত, পরিষ্কৃত ও সম-চতুরস্র প্রাঙ্গণ ছিল। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বে একটী প্রকোষ্ঠ ছিল। ঐ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে রোয়াক। এই প্রকোষ্ঠমধ্যে মহাদেবের পরমান্ন পাক হইত। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটী অন্ধকারময় সোপানসংযুক্ত গহ্বর ছিল। গহ্বরের মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সিঁড়ির দুই চারিটা ধাপ ও অন্ধকাররাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইত না।

অতি প্রত্যূষে একজন মালী এক পাত্র ফুল বিল্বপত্র রন্ধনশালার রোয়াকে ফেলিয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন এক আটী কাঠ, এক জন এক ভাণ্ড দুগ্ধ, একজন এক সের পরিমিত আতপ-তণ্ডুল ও কিঞ্চিৎ ঘৃত রাখিয়া যাইত। মধ্যাহ্নকালে একজন ব্রাহ্মণ এক কমণ্ডলু গঙ্গাজল হস্তে আগমন করিয়া পূজা করিতেন এবং স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন। শিবের সেবার্থ যতগুলি লোকের উল্লেখ করা গেল, সকলেই কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ ভূমির স্বত্ব যে তাহাদের বংশের কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)।

একালের শ্বাশুড়ী বউ।

আমাদের সমাজে একাদশ দ্বাদশ বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই অধিকাংশ কন্যার বিদ্যাচর্চ্চা পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ১৫।১৬ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, এবং তাহাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপ কন্যারা বিবাহের পর শ্বশুরালয় গমন করিয়া আদর্শ বধূ হইতে পারেন। কিন্তু এ নিয়ম বাঙ্গালি-সমাজে বহুল প্রচলিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্কা বালিকা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার দু এক দিবসের মধ্যেই পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আইসে। এখন হইতে সে বউ। তাহার স্বামীর পরিবারের মধ্যে সে একটি নবাগত ব্যক্তি। এই নূতন পরিবারের সকলেই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু কয় জন তাহার যথার্থ আত্মীয়?

পরিবারবর্গ ও পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে নববধূ দেখা ও তাহার সমালোচনা করা প্রথম কর্ম্ম। পুরাতন প্রথা-মত শ্বাশুড়ী স্বয়ং বউকে ঘরে তোলেন। বর কনে আসিবামাত্র একটা হুলস্থূল বাধিয়া যায়, সকলেই বউ দেখিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে ব্যস্ত। সকলেই বর ও তাহার পরিবারের বন্ধু, কিন্তু তাঁহারা ইহা বিস্মৃত হন যে, পরিবারের মধ্যে বধূও একজন। এই ভ্রমে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া কনের ও তাহার আত্মীয়গণের কুৎসা করিতে আরম্ভ করেন। দেখা গিয়াছে, এক স্থলে নববধূকে অভ্যর্থনা করিবার সময় সমাগত নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন "এমন সোণার চাঁদ ছেলে, তার যোগ্য কি এই বউ?" কেহ বা বেয়ানের উদ্দেশ্যে উপহাস করিয়া সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কিছু বলিলেন। কেহ বলিলেন "বিবাহের যোড় ভাল হয় নাই। কি থেলো কাপড় দিয়াছে, আর অল্প টাকা দিলেই ভাল চেলি হইত।" কেহ কেহ "ওমা গহনা দেখ, যেন ফুঁ দিলে উড়ে যায়!"

আর একজন বলিয়া উঠিলেন "দান-সামগ্রী দেখেছ কি? উহা কিরূপে সভায় বাহির করিয়াছিল? লজ্জা করে নাই?" নব বধূর সম্মুখেই এইরূপ আরও কত কথোপকথন চলিতে লাগিল। কোন্ বউ নিখুঁত সুন্দরী, কাহার বৈবাহিক অনেক টাকা দিয়াছিল, এ প্রকার অনেক কথা সে সময় হইল। হায়! কেহ ভ্রমেও ইহা বিবেচনা করিলেন না যে, বধূ নিজের রূপ অথবা অর্থের ত্রুটি সম্বন্ধে কিছু প্রতীকার করিতে পারে কি না?

কন্যার তৎকালীন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। এইমাত্র সে শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে। স্নেহময়ী মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীর অশ্রুভরা মুখ সে এখনও ভুলে নাই, তার উপর মাতৃ-পিতৃ-নিন্দায় তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, আর সহ্য হইল না—কাঁদিয়া ফেলিল। তখন একবাক্যে সকলে "ওমা এত বড় মেয়ের কান্না কেন গা? চুপ কর, আর কেঁদ না।" ইত্যাদি বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মধ্যে দু এক জন বউয়ের হইয়া দু চার কথা কহিলেন, কিন্তু দশ জনের মুখের নিকট এক জনের কথা কে শোনে? কাজেই তাঁহাকে নীরব হইতে হইল।

বিবাহের কনে প্রায় ৭।৮ দিন শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে, সে কয় দিন ধরিয়া বউ সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন হইয়া থাকে। সপ্তাহ গতে নববধূ পিতৃগৃহে গমন করে। সচরাচর বৎসরেক পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসে। তথায় আসিয়া বধূ দেখে তাহাকে কেহ মাতার মত স্নেহ করে না, বরঞ্চ কোনও কাজ করিতে না জানিলে, বা না পারিলে, কিম্বা তাহার দ্বারা সামান্য মাত্র কোনও ক্ষতি হইলে, তাহাকে ক্ষমা করা দূরের কথা, পরিবারস্থ সকলে শতমুখে তিরস্কার করেন। এ সময় তাহার কোমল মনে সম্ভবতঃ ইহাই উদয় হয় যে, 'মা ত আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন না, ইহারা কেন আমাকে এত তিরস্কার করে?' এ সময় বধূরা স্বামী ভিন্ন আর কাহারও ভালবাসা পায় না, এ নিমিত্ত সংসারের ভিতর তাহাকে আপনার বলিয়া জানে, সুতরাং সকল সুখ দুঃখের কথা স্বামীকে না জানাইলে প্রাণের কষ্ট ঘুচে না। এদিকে পুত্র নিজ মাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী মনে করেন, বউ আসা পর্য্যন্ত পুত্র তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করে না। ভাবিলেন ইহা বউমার শিক্ষা, কেননা মাতার চক্ষে আপন সন্তান মন্দ দেখা কঠিন।

ইহার পূর্ব্বে পুত্র আমার নিকট আসিয়া 'মা এটা দাও, ওটা দাও' কত কথাই বলিত, এখন আর সে ভাব নাই। অনর্থক এ প্রকার কয়েকটি কথা মনে আন্দোলন করিয়া, অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া মনে মনে বউয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। বউ পিতৃগৃহ হইতে আসিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার লইবে ও তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে, এবং তাঁহাকে নিজমাতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, পূর্ব্বে ইহাই তাঁহার মনে ধারণা ছিল। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল কই? হয় ত বউ ভাল কাজ করিতে পারে না, কারণ তাহার মাতা গৃহস্থালির কার্য্য তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে কন্যাকে কেবল লেখা পড়া, কার্পেট বোনা ইত্যাদি এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং

গৃহিণীর মনোমত বউ হইল না। তিনি প্রতিবাসিনীদের নিকট বৈবাহিকার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অধিকাংশ স্থলে এই লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত হয়। বউ তাঁহাকে পূর্ব্বের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না। শাশুড়ীও বউমাকে আর সেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন না। অল্পমাত্র সাংসারিক কারণে পরস্পরের মনে অসন্তোষের বীজ জন্মিতে থাকে। এ অবস্থায় বউ একটু অন্যায় করিলে (জানতই করুক বা অজানতই করুক, তাহা বিবেচনা না করিয়া) সক্রোধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। এ অবস্থায় শাশুড়ীর প্রতি বউয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়া অসম্ভব বলিতে হইবে। অপর বউ শাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া আপন শিশু পুত্র কন্যাদিগকে অকারণে প্রহার করিয়া নিজের ক্রোধ-শান্তি করেন, ইহাতে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। পৌত্র পৌত্রীকে বিনাপরাধে শাস্তি দেওয়া যেন তাঁহাকেই শিক্ষা দেওয়া, সুতরাং এরূপ অন্যায় অত্যাচার দর্শনে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে তীক্ষ তীক্ষ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিলেন—সে সময় পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। শাশুড়ীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধে আঁটিতে না পারিয়া, পরিশেষে বধূমাতা স্বামীর উপর সমস্ত রাগ ঝাড়িয়া তাঁহাকে পৃথক্ হইতে অনুরোধ করেন। কতক দিন দম্পতীর মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে, স্ত্রী শাশুড়ীর অধীনে থাকিতে একবারে অসম্মত। এজন্য মনে মনে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা— নিশ্চয়ই ভিন্ন হইতে হইবে। স্বামী বেচারা মহাবিপদাপন্ন।

এ দিকে স্ত্রীর অনুরোধ, ওদিকে গর্ভধারিণী মাতাকে ত্যাগ করা,—বিষম সমস্যা হইয়া পড়িল। কতস্থলে দেখা গিয়াছে বিপন্ন স্বামী এরূপ স্থলে দুই চারিটা আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীর বাক্যরূপ স্রোতে ভাসিয়া গেল এবং নিজেও তাহাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল, সুতরাং পরিণামে স্ত্রীর জেদই বজায় থাকিল। পৃথক্ হইয়াও বধূর মনে উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিল না, শাশুড়ীর প্রতি আক্রোশ বদ্ধমূল রহিল। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় কিম্বা পীড়া-কালে যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতেও অগ্রসর হইতে চাহেন না, বা এক কপর্দ্দক দ্বারা সাহায্য করাও আবশ্যক মনে করেন না।

সে কালের অনেক শাশুড়ী বউকে ভাল বাসিতেন না, অপরন্তু কেহ কেহ বউয়ের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রবণ করিলেও তনু রোমাঞ্চিত হয়, সুতরাং ক্রমে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে বউরা স্বাধীন হইতে আরম্ভ করিত। কোন কোন বউ হিংসা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শাশুড়ীর প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িত না, কেহ

কেহ বা মনের কষ্টে আত্মহত্যা করিত।

পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণেই হউক, কিম্বা সে কালের শাশুড়ীদিগের অমানুষিক ভয়ানক যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতেই হউক, একালের অধিকাংশ বধূ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বশীভূত হইতে চাহেন না। এখনকার বউরা আধুনিক শিক্ষাভিমানিনী (শিক্ষিত হউন বা না হউন) হওয়াতে আর শাশুড়ীদের প্রতি দৃকপাত করেন না। প্রাচীনাদের গ্রাহ্য করা বা তাঁহাদের মতে কার্য্য করা নিজেদের পক্ষে অপমান মনে করেন। এজন্যই অনেকের মধ্যে সদ্ভাব থাকে না।

অনেকে ইহা অবগত নহেন যে, কিরূপ ব্যবহার করিলে পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ জন্মিতে না পারে। সম্ভবতঃ আপন আপন উচিতানুচিত বিবেচনা করিয়া চলিলে কাহারও সহিত কলহ হওয়া সম্ভব নয়। শাশুড়ীর উচিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া বালিকা বধূ যখন প্রথম শ্বশুরগৃহে আসেন, তখন তাহাকে কন্যাসম যত্ন ও স্নেহ করা। যত্নে শোণিতপিপাসু হিংস্র পশু সিংহ ব্যাঘ্রও মানবের বশীভূত হয়। তবে বালিকা বধূ কেন শাশুড়ীর বাধ্য হইবে না? বধূ তাহার পিতা মাতার বিরুদ্ধে কোন কথা কেহ বলিলে বিরক্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এ কথাও মনে করা কর্ত্তব্য যে, স্নেহ না করিলে স্নেহ পাওয়া যায় না। বালিকাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে না, অতএব অপরের প্রতি মায়া মমতা একদিনে জন্মে না। ক্রমে ক্রমে সে যখন বুঝিতে পারিবে বাটীর সকলেই তাহাকে আপনার মত ভাবে এবং তদনুযায়ী স্নেহ করে, তখন তাহার ভালবাসা স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি জন্মিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই একদিন নববধূ হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে শাশুড়ীর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু নিজে শাশুড়ী হইলে আর পূর্ব্বের বিষয় স্মরণ করেন না। বধূ অবস্থায় যেরূপ দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন বধূর প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলে তাঁহারা আদর্শ শাশুড়ী রূপে পরিগণিত হইতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এ প্রবন্ধ পাঠে কেহ যেন ইহা না মনে করেন যে, এ কালের সমুদায় শাশুড়ীই বউদের কষ্ট দেন ও তাহাদের সহিত বিবাদ করেন, কিম্বা সকল বধূগণ শাশুড়ীদিগের সহিত কলহ করেন ও পৃথক্ হন। তাহা নয়। অনেক শাশুড়ী বধূদিগকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করেন। কন্যা ও বধূকে সমচক্ষে দেখিলে, তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়া অসম্ভব, ইহা তাঁহারা অবগত আছেন। অপরন্তু এই ভাবেন, পুত্র একাকী ভালবাসা ও সেবা যত্ন সমস্ত করিতে সক্ষম হইতে পারে না, এ জন্য তাহার প্রতিনিধিরূপে বধূ নিযুক্ত হইয়াছে; এ কারণে তাহাকেও নিজ তনয়ার মত স্নেহ করা উচিত। সুবুদ্ধি-

মতী শাশুড়ীর গুণে ও যত্নে মোহিত হইয়া বধূগণ আপনা হইতে তাঁহার প্রতি আসক্ত হন এবং সুবোধ সুশীলা হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে পরিবারবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। মাতার মত শাশুড়ী পাওয়াতে বধূও তাঁহাকে মাতৃসম ভালবাসেন। এরূপ স্থলে শ্রদ্ধা ভক্তি আপনি জন্মে। লক্ষ্মী-সম বধূর গুণে অনেক দুরন্ত শাশুড়ীও শান্ত হন। এ প্রকার সুগৃহিণীদের গৃহ সোণার সংসার রূপে পরিণত হয়।

শ্রীমতী সত্যবতী দেবী।

রাজপুত রমণীর বীরত্ব।

পাঠিকাগণের নিকট অদ্য এক রাজপুত রমণীর অদ্ভুত বীরত্বের বর্ণনা করিব। কিরূপে রাজপুত রমণীগণ স্বদেশ রক্ষার্থ মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া অম্লানবদনে স্বীয় সন্তানদিগকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রদান করিতেন, তাহা ইতিহাসে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সময়ে সময়ে রাজপুত রমণী অসিহস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পাশ্চাত্যদেশ সকলের ইতিহাসে এইরূপ স্ত্রীলোকের বীরত্ব-দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় "জোয়ান ডি আর্কের" নাম শুনিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চম হেনরি এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক ফ্রান্সদেশাধিপতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলে কেবল মাত্র জোয়ানের শৌর্য্যে ও বীর্য্যে ফ্রান্স দেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। স্পেনদেশের অন্তর্গত সারাগোসা নগর ফরাসীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল মাত্র এক যুবতীর সাহসিকতায় নগর রক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। সুবিখ্যাত সিপাহিবিদ্রোহের সময় ঝান্সির লক্ষ্মীবাই স্বয়ং ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মৃত হন। মহাবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর যৎকালে আমেদ নগর আক্রমণ করেন, তখন উহা কেবল একজন স্ত্রীলোকের বীরত্বে রক্ষিত হয়। যত দিন চাঁদবিবি জীবিত ছিলেন, ততদিন আকবর আমেদ নগর হস্তগত করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহী সৈনিকদিগের হস্তে চাঁদবিবি নিহত হইলে, আমেদ নগরের পতন হয়। আমাদিগের বর্ণনীয় ঘটনাটীও আকবরের রাজত্বসময়ে সংঘটিত হয়।

পাঠানবীর সের সার নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে অমরকোট নগরে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। আকবর যখন ত্রয়োদশ-

বর্ষীয় বালক, তখন তাঁহার পিতা ভারত-বর্ষে প্রবেশ করেন এবং পঞ্জাব প্রদেশ ও দীল্লি ও আগ্রা নগরদ্বয় জয় করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে আকবর রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের পরিসর এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে নামে মাত্র রাজা বলা যায়। কেবল মাত্র দীল্লি ও আগ্রা নগর তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিত। ক্রমে ক্রমে স্বীয় বুদ্ধি ও পরাক্রমে আকবর পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। রাজত্বের প্রথমেই আকবর রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রাজপুত রাজন্যবর্গের মধ্যে কয়েকজন মোগল সম্রাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, আর কয়েক-জনকে হস্তগত করিতে না পারিয়া সম্রাট্ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আকবর অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সহজে তাহা ছাড়িতেন না। রাজপুতানার মধ্যে মিবারের মহারাণাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই প্রথমে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিতে আকবর প্রয়াস পান। যখন আকবর দীল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন, প্রায় সেই সময়েই উদয় সিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুই জনের শিক্ষার বিশেষ প্রভেদ ছিল। আকবর প্রথম হইতেই বিপজ্জালে বেষ্টিত ছিলেন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় সেই সকল বিপদ অতিক্রম করেন, ইহাতে তাঁহার বিস্তর শিক্ষা হয়। প্রথম হইতেই আকবর যুদ্ধনিপুণ বীর্য্যবান্ বৈরাম ও অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন আবুল ফাজিল প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে তাঁহার শিক্ষার কিছু ত্রুটি হইতে পারে নাই। কিন্তু উদয় সিংহ প্রথম হইতেই চাটুকার এবং রমণীগণ দ্বারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত থাকাতে নিতান্ত ভীরু এবং রাজ্যশাসনে অপটু হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকবর সসৈন্যে মিবার রাজধানী চিতোর নগরের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিলে উদয় সিংহ একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ি-লেন। রাজাকে কর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী এক রমণী স্বয়ং যোদ্ধ্ বেশে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং কয়েকবার এরূপ প্রচণ্ডবেগে মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন যে, মোগল সৈন্য চিতোর পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া গেল।

উপরি-উক্ত আক্রমণ এবং রমণীর বীরত্ব সম্বন্ধে ফেরিস্তা গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই, তবে রাজপুতানার কবিগণ এই আক্রমণ এবং সম্রাটের আংশিক পরাভবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া থাকেন। এই যুদ্ধের সময় একবার রমণী-চালিত রাজপুত সৈন্য একবারে মোগল শিবিরশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকবরের শিবির সম্মুখে উপনীত হইয়াছিল। যাহা হউক, পুনরায় আক-বর স্বদলবলে আসিয়া চিতোর নগর অবরোধ করিলেন। ভীরু উদয় সিংহ